# আরবের চাঁদ

স্বামী লক্ষ্মণ প্রসাদ

অনুবাদ
শাহাদাত হুসাইন

মাকতাবাতুল হাসান

**আরবের চাঁদ**
**প্রথম প্রকাশ :** জিলকদ ১৪৪২/জুলাই ২০২১
**গ্রন্থস্বত্ব :** প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
**প্রকাশনায়**
**মাকতাবাতুল হাসান**
গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স
৩৭ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০

**অনলাইন পরিবেশক**
rokomari.com - wafilife.com - quickkcart.com
**ISBN :** 978-984-8012-79-6
**Web :** maktabatulhasan.com

**Fixed Price : 380 Tk**

**[ দরদামে সময় বাঁচাতে বই কিনুন নির্ধারিত মূল্যে ]**
**[ বইটি দাওয়াহর উদ্দেশ্যে বিতরণের ক্ষেত্রে থাকবে বিশেষ ছাড় ]**

Page : 387, Page in actual : 416, Forma : 26

**Araber Chand**
by Swami Laxman Prasad
Published by : Maktabatul Hasan Bangladesh
E-mail :info.maktabatulhasan@gmail.com ǁ fb/Maktabahasan

* * *

﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾

তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসুল এসেছেন। তোমাদের দুঃখকষ্ট তাঁর পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল এবং দয়ালু। [সুরা তাওবা : ১২৮]

* * *

**আরবের চাঁদ**

**মূল উর্দু গ্রন্থ** : আরব কা চান্দ

**মূল** : স্বামী লক্ষ্মণ প্রসাদ

**অনুবাদ** : শাহাদাত হুসাইন

**সম্পাদনাপর্ষদ**

অনুবাদ নিরীক্ষণ : মাহমুদুল হাসান, আছিফুজ্জামান

তথ্য সম্পাদনা : মিশকাত আহমদ

ভাষা সম্পাদনা : রেদওয়ান সামী

**বানান সমন্বয়** : মাসউদ আহমাদ, মুনতাসির বিল্লাহ, মুহিব্বুল্লাহ মামুন, নূর মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ, সাজ্জাদ শরিফ

**পৃষ্ঠাসজ্জা** : আবু আফিফ মাহমুদ

**প্রচ্ছদ** : আখতারুজ্জামান

©

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত; প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত যেকোনো মাধ্যমে বইটি আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রকাশ একেবারেই নিষিদ্ধ।

## অনুবাদকের কথা

একদিন মাদরাসার গ্রন্থাগারে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন গ্রন্থ দেখছিলাম। হঠাৎ একটি গ্রন্থের ওপর চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়াই। হাতে নিয়ে দেখি—একটি সিরাতগ্রন্থ, লেখক স্বামী লক্ষ্মণ প্রসাদ। অর্থাৎ, একজন হিন্দু লিখেছে নবীজির সিরাত! হৃদয়ে একধরনের পুলক অনুভব করলাম। এতে নিশ্চয় ব্যতিক্রম কিছু আছে। সেখানে দাঁড়িয়েই পড়তে শুরু করি। কয়েক পৃষ্ঠা পড়েও ফেলি। এরপর পড়ার টেবিলে এসে শুরু করি ধারাবাহিক পাঠ। যতই পড়ি হৃদয়ে ততই যেন অন্যরকম এক ভালোলাগা ও ভালোবাসার পারদ বাড়তে থাকে। পড়ি আর ভাবি, একজন হিন্দু হয়েও আমাদের প্রিয় রাসুলকে এতটা ভালোবাসেন! রাসুলের ভালোবাসায় এভাবে মালা গাঁথতে পারেন! অথচ আমি, আমরা...

কিছুদিন পর আমার এক ওস্তাদ (আল্লাহ! তার ছায়াকে আমাদের ওপর আরও দীর্ঘায়ত করুন)-এর নিকট গ্রন্থটি নিয়ে গেলাম। তিনি সেদিন বেশ কিছু কথা বলেছিলেন। সেদিনের একটি কথা এখনো আমার কানে গুঞ্জরণ তোলে—'এই ধরনের গ্রন্থগুলো কিন্তু আমাদের জন্যও পরীক্ষা, তাদের জন্যও পরীক্ষা। তাদের জানাশোনা আছে কিন্তু ঈমান নেই। আবার রাসুলের প্রতি আমাদের ঈমান আছে, পাশাপাশি সিরাতের জ্ঞানও আছে, তবে ব্যক্তি বিশেষে তা নিতান্তই অপ্রতুল, যা একেবারেই কাম্য নয়।'

সত্যিই! আকাশ-বাতাস মুখরিত করে আমরা রাসুলের ভালোবাসার দাবি করি। অথচ দিনশেষে এতটাই হতভাগা রয়ে যাই যে, প্রতিদিন অল্পকিছু সময়ও সিরাতপাঠে ব্যয় করতে পারি না!

সিরাতগ্রন্থ অমুসলিম অনেকেই লিখেছেন। বিশেষভাবে প্রাচ্যবিদ অমুসলিম লেখকদের মধ্যে যারা সিরাত লিখেছেন, তারা বেশ আটঘাট বেঁধেই সিরাতের বিভিন্ন সুস্পষ্ট বিষয়ে সন্দেহ-সংশয় ও আপত্তি উত্থাপনের অপপ্রয়াস চালিয়েছেন। এই ধরনের লেখকদের লেখায় প্রভাবিত হয়ে অনেক মুসলিম লেখকও ইসলামি শরিয়তের স্বীকৃত বিভিন্ন বিষয়ে আপত্তি বা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। অপরদিকে এমনকিছু অমুসলিম লেখকও রয়েছে, যারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার টানে তাঁর প্রশংসা বাক্য লিখেছেন পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা। স্বামী লক্ষ্মণ প্রসাদ তাদেরই

একজন। তার লেখার অন্যতম সৌন্দর্য এই, লেখার মধ্যে তিনি কোনো প্রচ্ছন্নভাব রাখেননি, বেশ সুস্পষ্টভাবে সিরাতের প্রতিটি দিক সংক্ষিপ্তাকারে হলেও তুলে ধরেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি পাশ কেটে যাওয়ার পন্থা গ্রহণ করেননি। এ প্রসঙ্গে তিনি এক জায়গায় লিখেছেন,

'আমি যা-কিছু লিখেছি, নিজের বিশ্বাসের আলোকেই লিখেছি। কারও দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নয়।'

জিহাদ ও মুজেজাসহ সিরাতের বিভিন্ন বিষয়ে প্রাচ্যবিদ এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত মুসলিম লেখকরা যেখানে আপত্তি ও সংশয়ের তির নিক্ষেপ করেছেন, সেখানে তিনি সেসবের পক্ষে জোরালো যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করে ভালোবাসার নজরানা পেশ করেছেন। কবিতার ছন্দে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, হৃদয়রাজ্যে তিনি আমাদের নবীজির জন্য ভালোবাসার কী এক সবুজ প্রাসাদ তৈরি করে রেখেছেন। প্রিয় নবীর ব্যথায় কখনো তিনি কাতরে উঠেছেন, আবার পর মুহূর্তেই কাফেরদের পরাজয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন।

এখানে একটি বিষয় সবার কাছেই স্পষ্ট হওয়া জরুরি যে, শুধু স্বামী লক্ষ্মণ প্রসাদই নয়; বরং যেকোনো অমুসলিম লেখক বা তাদের দ্বারা প্রভাবিত লেখকের লিখিত ইসলামিগ্রন্থ পড়তে হলে অবশ্যই কিছু বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। তদ্রুপ এ গ্রন্থ পাঠেও আমাদের কিছু নীতি অনুসরণ করতে হবে। যথা :

১. এটি এক অমুসলিমের লিখিত সিরাতগ্রন্থ; তাই বইটি পাঠের সময় একটু সতর্ক হয়ে পড়া চাই। বইটির মৌলিক উদ্দেশ্য হলো বিশ্বনবীর প্রতি একজন অমুসলিমের ভালোবাসার চিত্র তুলে ধরা। শুধু সিরাতপাঠ এই গ্রন্থের মৌলিক উদ্দেশ্য নয়।

২. এটি সিরাতের কোনো মৌলিক গ্রন্থ নয়। সুতরাং এর কোনো কথা বা বক্তব্য দলিল হিসেবে নেওয়া সমীচীন হবে না। হ্যাঁ, যদি সেই কথাটি সিরাতের মৌলিক কোনো গ্রন্থে উল্লেখিত থাকে, তাহলে ভিন্ন বিষয়।

৩. কোথাও হয়তো দেখা যাবে যে, লেখক কোনো বিষয়কে ইসলামি আকিদা বা রীতিনীতি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন; অথচ আদৌ তা ইসলাম সমর্থিত নয়। এই ক্ষেত্রে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। তাই এই ধরনের গ্রন্থপাঠের আগে ও পরে নির্ভরযোগ্য কোনো সিরাতগ্রন্থ অধ্যয়নে থাকা উচিত। এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে

মাওলানা আব্দুল মালেক হাফিজাহুল্লাহ-এর *নির্বাচিত প্রবন্ধ–১* বইটির ১০৫-১১৩ পৃষ্ঠাগুলো পড়ুন।

তবে আস্থার বিষয় যে, আমরা বইটিকে সাধারণ পাঠকের উপযোগী করার জন্য গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাগুলোর সূত্র সংযোজন করেছি এবং জাল-বানোয়াট ও নবীজীবনের সঙ্গে সংঘর্ষপূর্ণ বর্ণনা থেকে মুক্ত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।

গ্রন্থটির অনুবাদ শুরু করার পর বেশ দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। জীবনের অনেকগুলো সময় অলসতার চোরাবালিতে হারিয়ে যায়। আলহামদুলিল্লাহ, দেরিতে হলেও একসময় অনুবাদের কাজ শেষ হয় এবং মাকতাবাতুল হাসান-এর সুদৃষ্টির ফলে পাঠকের হাতে পৌঁছে যাচ্ছে। আল্লাহ তাআলা প্রকাশনী-সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন। গ্রন্থটির অনুবাদ ও তাহকিকের ক্ষেত্রে আরও যারা আমায় সঙ্গ দিয়েছেন, এই মুহূর্তে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে তাদের স্মরণ করছি। কেয়ামতের দিন যেন আল্লাহ নিজেই তাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যান।

পরিশেষে সুহৃদ পাঠকের কাছে নিবেদন, মানুষ ভুলত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়। উপরন্তু সে মানুষটি যদি হয় আমার মতো সর্বদিক থেকেই অপরিপক্ব; তাহলে তো...! তবুও কাঁচা হাতের কিছু উপহার তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছি প্রিয় ভাই-বোনদের করকমলে। তাই শুধু এতটুকুই নিবেদন; ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন, দোয়া করবেন, পরামর্শ দেবেন, শুধরে দিয়ে পাশে থাকবেন।

ওয়াসসালাম।

নিবেদক

**শাহাদাত হুসাইন**

২৩/০৩/২০২১ খ্রি.

স্বামী লক্ষ্মণ প্রসাদের অকৃত্রিম বন্ধু

## হাকিম মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ-এর অভিমত

অনেকের ধারণা, এই গ্রন্থের মূল লেখক কোনো মুসলিম। ব্যবসা কিংবা প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যে স্বামী লক্ষ্মণ প্রসাদ নামটি ব্যবহার করা হয়েছে। এমনকি কেউ কেউ তো আমাকেই এই গ্রন্থের লেখক বলে অভিহিত করে থাকেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, বারবার আমার পক্ষে বিষয়টি অস্বীকার করা এবং মূল বিষয় সম্পর্কে অবহিত করার পরও তারা এই কথা মানতে নারাজ যে, স্বামী লক্ষ্মণ প্রসাদই এই গ্রন্থের লেখক।

সম্ভবত এর বড় একটি কারণ, উর্দু লেখার যোগ্যতা; বিশেষ করে এমন উঁচু মানের উর্দু সাহিত্যসম্পন্ন সিরাতের কিতাব কোনো হিন্দু লিখতে পারে, তা মানুষের কল্পনারও বাইরে। অথচ এর আগেও হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায়ের অসাম্প্রদায়িক অনেক গুণিজনেরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাতগ্রন্থ লিখে ধন্য হয়েছেন। কিন্তু মানুষ তাদের লিখিত গ্রন্থের ব্যাপারে এ রকম বিস্ময় প্রকাশ করেনি তো! ভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর কেউ যখন অন্য সম্প্রদায়ের কোনো নেতাকে নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেন, তখন তারা সাধারণত যে আঙ্গিকে লেখেন তিনিও ঠিক সেই আঙ্গিকেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী লিখেছেন। কিন্তু অন্যান্য অমুসলিম সিরাত লেখকদের বিপরীতে *আরবের চাঁদ* গ্রন্থের লেখক অনেকটা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রেমসাগরে হাবুডুবু খেতে খেতে কলম চালিয়েছেন। দুনিয়ার সবকিছু থেকে উদাসীন হয়ে সিরাতের ময়দানে অশ্ব হাঁকিয়েছেন। এমনকি সিরাতের কোনো বিষয়ই তিনি বাদ দেননি। অনেক মুসলিম বুদ্ধিজীবীও জিহাদ এবং মুজেজার সঠিক ব্যাখ্যা বুঝতে যেখানে অক্ষম এবং সঠিক রাস্তা হারিয়ে বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা ও কৌশল অবলম্বন করেন, সেখানে তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালোবাসায় বড় বড় টিলা-খন্দকও নির্দ্বিধায় অতিক্রম করে গিয়েছেন। শুধু পথই অতিক্রম করেননি, বরং যারা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তাদের নিয়েও ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছেন।

মানুষকে লক্ষ্য করে স্বামী লক্ষ্মণ প্রসাদ বলেছেন, দুনিয়ার মানুষ! এই যে তোমরা উঁচু উঁচু টিলা ও খানাখন্দক দেখছ, দ্বীনের পথে চলা মুসাফিরদের জন্য এগুলো পরীক্ষার নমুনা। এই সরল-সঠিক পথে যে মুসাফির অটল-

অবিচল থাকতে পারবে, সেই নিজ গন্তব্যে অতি দ্রুত পৌঁছতে পারবে। সতর্কতা ও বিচক্ষণতার পথে যারা ধীরগতিতে চলে, অনেক সময় তারা ইসলামের শত্রুদের বইপুস্তক ও রচনাবলি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে।

যাহোক, আমি বলছিলাম, যেসব মাসআলা অনেক মুসলিম বুদ্ধিজীবীও ইসলাম সম্পর্কে অনবগতির কারণে মেনে নিতে সংকোচ ও লজ্জাবোধ করেন, স্বামী লক্ষ্মণ প্রসাদ নির্দ্বিধায় সেসব মাসআলা যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত বলে স্বীকার করেছেন। উপরন্তু আল্লাহকে তিনি প্রভু হিসাবে বিশ্বাস করেন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও 'রাসুলুল্লাহ' বলে মান্য করেন। এমনকি কয়েক জায়গায় তো এমন বাক্যও লিখেছেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর আমার বাবা-মা ও আমার প্রাণ হাজারবার উৎসর্গ হোক'। আশ্চর্য ও দুঃখজনক বিষয় হলো, এতকিছুর পরও তিনি বাহ্যিকভাবে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেননি। হিন্দুধর্মাবলম্বী হয়েই জীবনযাপন করেছেন। এটা এই কারণে নয় যে ইসলামের সত্যতার ব্যাপারে তার কোনো সন্দেহ বা সংশয় ছিল, কিংবা হিন্দুধর্মের যৌক্তিকতায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। বরং জীবনের দীর্ঘ একটা সময় তিনি ব্যয় করেছেন ইসলামের পক্ষে হিন্দুদের সব আপত্তি ও বিরোধিতার দাঁতভাঙা জবাব দিয়ে। একজন হিন্দু হয়েও ইসলামের জন্য নিজ ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তিনি দ্বিধা করতেন না।

প্রিয় পাঠক, ভেবে দেখুন তো এর কারণ কী? যদি এটি শুধুই স্বামী লক্ষ্মণ প্রসাদের ব্যক্তিগত বিষয় হতো, তাহলে পাঠকদের আমি এই লাইনগুলো পড়ার কষ্ট দিতাম না এবং এই বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতেও বলতাম না। কিন্তু বিষয়টি আমাদের পুরো জাতির সঙ্গেই সম্পৃক্ত। সম্ভবত অতিরঞ্জন না করেই আমি বলতে পারি, লাখ লাখ নয় বরং কোটি কোটি মানুষ অত্যন্ত কঠিন একটি প্রতিবন্ধকতার কারণে আজ ইসলাম গ্রহণ করছে না। যতদিন সেই প্রতিবন্ধকতা দূর না হবে, ততদিন অসংখ্য অমুসলিম বিধর্মীদের চারণভূমিতে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে এবং ইসলামের সবুজ-শ্যামল বাগানে বিচরণ করতে পারবে না। শুধু তাই নয়, আমাকে যদি আপনারা সত্য বলার অনুমতি দেন, তাহলে আমি সাফ সাফ এ কথা বলে দেবো যে, দূরের মানুষকে কাছে টানা তো দূরের কথা, নিজেদের গুনাহের কারণে লাখ লাখ মুসলিম আজ ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

কোন প্রতিবন্ধকতা? যা অসংখ্য অমুসলিমকে ইসলামের ছায়াতলে আসতে দিচ্ছে না! কোন সে অপরাধ, যা মুসলিমদের বের করে দিচ্ছে ইসলামের

গণ্ডি থেকে? যদি আমি নিজ কলম দিয়ে আপনার সেই প্রশ্নের উত্তর দিই, তাহলে হয়তো আপনি তা অস্বীকার করবেন। তাই স্বামী লক্ষ্মণ প্রসাদের একটি লেখা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। আশা করি আপনারা এর মাধ্যমে মূল কারণটি বুঝতে সক্ষম হবেন। তিনি তার এক চিঠিতে লিখেছেন,

> যখন আমি মসজিদের পাশ দিয়ে যাই, আমার চলারগতি তখন নিজে নিজেই শ্লথ হয়ে আসে। যেন কেউ আমার জামার আস্তিন টেনে ধরেছে। আমার পা-দুটি সেখানেই থেমে যেতে চায়। হঠাৎ মনে হয়, হৃদয়ের সব প্রশান্তি যেন সেখানেই। আমি তখন নিজেকে হারিয়ে ফেলি। কে যেন মসজিদের ভেতর থেকে আমার হৃদয়কে মোহগ্রস্ত করছে, আমাকে কাছে টানছে। এক পা দু-পা করে করে মসজিদের ভেতরে আমায় টেনে নিচ্ছে। আহা! আমি যখন মুয়াজজিনের কণ্ঠে আল্লাহু আকবার-এর ধ্বনি শুনি, তখন যেন আমার হৃদয়রাজ্যে তুফান শুরু হয়! মনে হয়, কোনো শান্তশিষ্ট সমুদ্র হঠাৎ যেন উত্তাল হয়ে উঠেছে! যখন আমি মহিমান্বিত প্রভুর সামনে নামাজিদের সেজদাবনত হতে দেখি, আমার আলস্যের ঘুমে বিভোর দুচোখ তখন সজাগ হয়ে যায়। যেন এক দুঃস্বপ্ন থেকে কেউ আমায় জাগিয়ে দিয়েছে। আমি তখন চঞ্চল হয়ে পড়ি।
>
> কিন্তু যখন মসজিদ থেকে কয়েক পা সামনে যাই, আমার চোখের সামনে মুসলিমদের প্রতিদিনের যাপিত জীবনের করুণ দৃশ্য ফুটে ওঠে। হায়! তাদের রং আজ কতটা ফ্যাকাশে! আহা, তারা আজ কতটা বিপথে! তাদের লেনদেন আজ কতটা অস্বচ্ছ! খাবারের পাত্র কতটা সংকীর্ণ!
>
> আমি তখন ভাবতে থাকি, এই যে মুসলিম সম্প্রদায়, যারা শুধু এই কারণেই মুসলিম যে, তারা মুসলিম মা-বাবার ঘরে জন্ম নিয়েছে। তাদের মুখেই শোনা যায় ইসলামের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা। অথচ তাদের কর্মকাণ্ডের কোথাও ইসলামের ছিটেফোঁটাও নেই। এই যে মুসলিম, তারা শুধু আকৃতি ও নামের মুসলিম, কাজের মুসলিম নয়। যাদের দেহটাই শুধু মুসলিম কিন্তু হৃদয়টা প্রাণহীন। মুখে মুখে আল্লাহকে প্রভু বলে বিশ্বাস করে। অথচ প্রবৃত্তিই তাদের আসল প্রভু। কী লাভ হবে, যদি কারও বাহিরটা মুসলিম হয় আর ভেতরটা কাফের হয়?

জেনে রাখুন, ধর্মের সম্পর্ক শুধু জুব্বা-পাগড়ি আর লম্বা দাড়ির সঙ্গে নয়, বরং ধর্মের সম্পর্ক মানুষের হৃদয়-আত্মার সঙ্গেও।

যারা অমুসলিমদের মধ্যে দাওয়াতের কাজ করছেন, তাদের উদ্দেশে বলছি, আপনারা আপনাদের দীর্ঘ তেরোশ বছরের ইতিহাসের পরতে পরতে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজুন যে, জাতির মানমর্যাদা ও শক্তিসামর্থ্য কী সুউচ্চ ঈমানের মধ্যে রয়েছে না সংখ্যার আধিক্যে? পুরো পৃথিবীকে ইসলামের পতাকাতলে দেখার স্বপ্ন যারা বুকে লালন করেন, তারা যদি সব দাওয়াতি কার্যক্রম ও চেষ্টা-প্রচেষ্টা আপন মুসলিম ভাইদের পেছনেই ব্যয় করতেন, তাহলে তা তাদের স্বপ্নের সর্বোত্তম ও সমুজ্জ্বল বাস্তবতায় রূপ নিত।

একজন অমুসলিমকে মুসলিম বানিয়ে যতটুকু সওয়াব অর্জন করা যায় তারচেয়েও বহুগুণ সওয়াব অর্জিত হবে যদি কোনো নামকাওয়াস্তে মুসলিমকে প্রকৃত মুসলিম হিসাবে গড়ে তোলা যায়।

আহা, মুসলিমরা যদি আমার হৃদয়ের এই ব্যথাটা বুঝত! আমার এই ভাঙা ভাঙা কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করত! আমার সজল দু-চোখের নোনাজল অনুভব করত!

প্রিয় পাঠক, এই চিঠির প্রতিটি শব্দকেই হৃদয়ের চোখ দিয়ে পড়ুন এবং চিন্তা করুন। ইসলামের আকিদা-বিশ্বাস, মূলনীতি ও আল্লাহর পবিত্র নাম কীভাবে স্বামী লক্ষ্মণ প্রসাদকে নিজেদের দিকে আকর্ষণ করেছিল। আর কীভাবে মুসলিমদের পচা-দুর্গন্ধময় জীবনাচার দেখে তার দু-হাত শিকলাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল।

বর্তমান পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ রয়েছেন, যারা সবকিছুকেই বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করেন। যার কারণে 'বৃক্ষ তোর নাম কী, ফলে পরিচয়'-এর ন্যায় তারাও মুসলিমদের জীবনাচার দেখে ইসলাম, কুরআন ও নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঘৃণা করতে শুরু করে।

প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা! একটু চিন্তা করুন। আমরা নিজেদের দুরাচার আর পাপাচারের কারণে কীভাবে ইসলাম, কুরআন ও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে (নাউজুবিল্লাহ) অপমানিত করছি। তাই দয়া করে আসুন, আমরা অন্তত আল্লাহর জন্য, ইসলামের জন্য, সত্য নবীর জন্য এবং কুরআনের জন্য হলেও নিজেদের পরিশুদ্ধ করে নিই। অন্যথা মনে রাখবেন, কেয়ামতের দিন অসংখ্য অমুসলিম আপনাদের টেনেহিঁচড়ে আল্লাহর সামনে

নিয়ে যাবে এবং মহান আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করে বলবে, আল্লাহ, আমরা তোমার প্রেমিক ছিলাম। তোমার সত্য ধর্ম, সত্য বিধান ও সত্য নবীর অন্বেষী ছিলাম। কিন্তু এই জালেম পাপিষ্ঠরা আমাদের সেই সত্য পর্যন্ত পৌঁছতে দেয়নি। বলুন প্রিয় ভাই, সেদিন আমরা কী জবাব দেবো?

ইসলাম তো এসেছে পৃথিবীর বুক থেকে অহংকার, প্রতারণা, মিথ্যা, অন্যের দোষচর্চা, অঙ্গীকার পূরণ না করা, চুরি, জিনা-ব্যভিচার ও জুলুম-নিপীড়নের মতো মানবতাবিরোধী এসব অপরাধ থেকে পৃথিবীকে পবিত্র করতে, অথচ মুসলিম সম্প্রদায় নিজেরাই আজ এসবে লিপ্ত, তা কি কখনো ইসলাম চেয়েছে?

প্রিয় ভাইয়েরা, একই মুহূর্তে যদি কোনো বস্তু সাদা-কালো দু-রং ধারণ করতে না পারে, দুই দুই-য়ে যদি সবসময় চারই হয়, তিন আর পাঁচ না হয়, সুস্থতা ও অসুস্থতা, ঠান্ডা ও গরম, জুলুম ও ইনসাফ, দয়া ও নির্মমতা এবং সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য যদি কখনো একত্র হতে না পারে; তাহলে মুসলিম আর ঘুষখোর, মুসলিম আর সুদখোর, মুসলিম আর চোর, মুসলিম আর ব্যভিচারী, মুসলিম আর মিথ্যাবাদী, মুসলিম আর অত্যাচারী, মুসলিম আর কাপুরুষ, এটা কীভাবে সম্ভব হতে পারে?

তাই প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা, আসুন! নিজেরা সুমহান চরিত্রের অধিকারী হই। এতটা সুমহান আর এতটা সুউচ্চ যে, যেখানে গিয়ে পৃথিবীর সব উচ্চতা শেষ হয়ে যায়। কারণ, রহমাতুল লিল আলামিন বলেন, উত্তম চরিত্রকে সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে দিতেই আমাকে পাঠানো হয়েছে। আর হ্যাঁ, এই উত্তম চরিত্রের তরবারির আঘাতেই অত্যাচারী ও রক্তপিয়াসি পৃথিবী তাঁর সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসেছিল। তাঁর কাছ থেকে ব্যথার উপশম নিয়েছিল।

প্রিয় ভাই, আপনার উত্তম আচরণই তাকে আপনার কুরআন, আপনার ইসলাম এবং আপনার রাসুলের হেদায়েত সম্পর্কে জানতে আগ্রহী করে তুলবে। আপনি তো ইসলামের এক ভ্রাম্যমাণ প্রচারক। আপনার জীবনযাপন আর চলাফেরা অপরের কাছে ইসলামের বার্তা পৌঁছে দেবে। কুরআনই হবে আপনার আদর্শ। মহান চরিত্রের অধিকারী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শের রঙেই আপনার জীবন রঙিন হবে। পৃথিবীর সামনে আপনিই হবেন ইসলামের সুমহান আদর্শের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। হ্যাঁ বন্ধু, আপনিই সে ব্যক্তি, এই দিগ্‌ভ্রান্ত পৃথিবীকে যে সঠিক পথ দেখাবে। আপনিই পারবেন এই আঁধারে ঢাকা পৃথিবীতে আলো ছড়াতে।

যাহোক, আমি মূলত স্বামী লক্ষ্মণ প্রসাদের পরিচয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম। যেন, লেখকের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় হয়ে যায়।

১৯২৯ সালের কোনো একদিনের ঘটনা। অপরিচিত কোনো এক ব্যক্তির কাছ থেকে একটি চিঠি এলো। চিঠিতে প্রেরক আমাকে সম্বোধন করে বেশ কিছু কথা বলেন। সেখানে একটি কথা ছিল, 'মুহতারাম, আমি আপনার রচিত বেশ কিছু বই পড়েছি। এখন আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই'।

চিন্তা ও কল্পনার অনুভূতির মাধ্যমে আমি এই পত্রপ্রেরকের যোগ্যতা ও আমার প্রতি তার অকৃত্রিম ভালোবাসা অনুভব করলাম। তাই আমিও তাকে আমার কাছে আসার জন্য পত্র লিখলাম।

সম্ভবত চিঠি প্রেরণের তৃতীয় দিন। ১৭-১৮ বছরের বেশ হাস্যোজ্জ্বল ও সুন্দর পোশাক পরিহিত এক দীর্ঘদেহী যুবক আমার কাছে এলো এবং নিজ পরিচয় দিয়ে বলল, আমিই লক্ষ্মণ প্রসাদ। আজকাল আমি আমার পরিবেশের ওপর চরম ত্যক্তবিরক্ত। চারপাশটা যেন বিষিয়ে উঠেছে। অবস্থা এই পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে, বর্তমানে আমার নিজ পরিবারের সঙ্গেও আমার যোগাযোগ নেই। অনেকটাই একা হয়ে পড়েছি। এখন এমন কোনো শিক্ষার পরিবেশ খুঁজছি, যেখানে আমি আমার পড়াশোনা ও জ্ঞানচর্চা করতে পারব। তাই আপনার কাছে এসেছি। এখন আপনিই আমার পিতা, আপনিই আমার ভাই, আপনিই আমার সব। দয়া করে আমাকে আপনার শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করুন।

তার সাদামাটা এই কথাগুলো আমার দুর্বল কাঁধে এমন ভারি বোঝা চাপিয়ে দিলো যে, সে ভার আমি আজও অনুভব করি। হৃদয়ের কোথায় যেন তার জন্য বেশ মায়া লাগে। খুব কাছের কেউ মনে হয়। তাই আমি তার জন্য আমার হৃদয়ে ভালোবাসার দুয়ার খুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত লাইব্রেরির দরজাও উন্মুক্ত করে দিলাম। যেখানে সে আমার একান্ত প্রিয় মানুষের মতো অবস্থান করতে লাগল।

সেই দিনগুলোতে তো নানা বিষয়েই তার সঙ্গে কথোপকথন হতো। প্রায় সব ধরনের গ্রন্থই সে অধ্যয়ন করে নিয়েছিল। তবে চিকিৎসাশাস্ত্র ও ইতিহাসপাঠে তার আগ্রহ ছিল বেশি। তার মতে, চিকিৎসার মাধ্যমে অসুস্থ প্রাণীরা সুস্থতা লাভ করে। আর ইতিহাস অধ্যয়নের মাধ্যমে অসুস্থ জাতি নিজেদের রোগ নির্ণয় করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। খুশির কথা হলো, আমার এই প্রিয় মানুষটি চিকিৎসাজগতে রাজকুমার কৃষ্ণ নামে পরিচিত হয়ে ওঠে এবং কয়েক বছর পর্যন্ত *আবেহায়াত* নামক চিকিৎসা-বিষয়ক একটি পত্রিকা তার

দক্ষ হাতের সম্পাদনায় টোহানা-এর মতো এক অজপাড়াগাঁ থেকে বেশ ভালোভাবেই প্রকাশিত হয়। তা ছাড়া সিরাত-বিষয়ক '*আরবের চাঁদ*' নামক মহামূল্যবান গ্রন্থটি তো এখন আপনাদের সামনেই।

আফসোস! ১৯৩৯ সালে সে এই টোহানাতেই ইহধাম ত্যাগ করে।

মৃত্যুর আগে সে নিজের মহামূল্যবান দাওয়াখানা, লাইব্রেরি এবং বেশ কিছু নগদ অর্থ আমার নামে লিখে দেওয়ার অসিয়ত করে। তবে পরবর্তী সময়ে যদিও কেউ মৃত ব্যক্তির এই শেষ ইচ্ছা পূরণ করেননি। কিন্তু সাহিত্য ও ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তার লিখিত অনেকগুলো পাণ্ডুলিপি আমার হাতে আসে। ইনশাআল্লাহ সময় করে তা প্রকাশ করার চেষ্টা করব।

স্বামী লক্ষ্মণ প্রসাদ অত্যন্ত পরিশ্রমী, সত্যবাদী ও সাহসী মানুষ ছিলেন। তার সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য ছিল, তিনি নিজ হৃদয়ের বিপরীতে কখনো কথা বলতেন না। মনে এক কথা মুখে অন্য কথা, এমন নিকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী ছিলেন না।

একবারের ঘটনা, তার এক হিন্দু বন্ধু তাকে অনেক উপহার-উপঢৌকনের লোভ দেখিয়ে বলল, দয়া করে তুমি আমাকে স্বামী দিয়ানন্দের জীবনী লিখে দাও। কিন্তু *আরবের চাঁদ*-এর নন্দিত লেখক এই বলে তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন যে, আমি স্বামী দিয়ানন্দকে এতটা উপযুক্ত মনে করি না যে, আমার কলম দিয়ে তার জীবনী লিখব।

তিনি অত্যন্ত ভদ্র ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী একজন যুবক ছিলেন। প্রায় ২৬ বছর বয়সেই যিনি এই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেন। স্বামী লক্ষ্মণ আজ আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তার সুবাসিত কলমের সৌরভ আজও আমাদের বিমোহিত করে রেখেছে। প্রিয় পাঠক, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালোবাসার অতল সমুদ্রে ডুব দিয়ে এক হিন্দু যুবক—যে এ বই লিখেছে, এখন আপনি তা পাঠ করুন এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সর্বোত্তম জীবনাদর্শকে সামনে রেখে স্বীয় জীবনের প্রতিটি শাখাতেই তা অনুসরণের চেষ্টা করুন। মনে রাখবেন, এই কাজটিই আপনার ইহকাল ও পরকালের সফলতা এনে দেবে। কারণ, তাঁর অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে মানবতার সঠিক কল্যাণ ও মুক্তি।

নিবেদক

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফাআত প্রত্যাশী
বান্দা হাকিম মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ (১৯০৪-১৯৭৪ খ্রি.)

# লেখকের কথা

## পৃথিবীব্যাপী উন্নতির জোয়ার

পাশ্চাত্যের কথিত সভ্য ও শিক্ষিত মানুষদের জীবনযাপন ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রতি লক্ষ করলে এই কথা সবার কাছেই সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, বর্তমান পৃথিবীতে উন্নতি ও অগ্রগতির এক বিস্ময়কর প্রতিযোগিতা চলছে। পৃথিবীর প্রতিটি কোণ থেকে, প্রতিটি জনপদ থেকে, প্রতিটি ভূখণ্ড থেকে জেগে ওঠার ডাক উঠেছে। উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাওয়ার দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে মানুষ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। নতুন প্রজন্মের আগ্রহ-উদ্দীপনা দেখে তো মনে হচ্ছে তারা সৌরজগতের সীমানা পেরিয়ে সপ্ত আকাশ পাড়ি দিয়ে আরশের গোপন রহস্য উন্মোচন করতেও অস্থির হয়ে উঠেছে। যার মাধ্যমে তারা এই আঁধারে ছাওয়া পৃথিবীকে জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আলোয় আলোকিত করে তুলবে।

বিশ্বের প্রত্যেক সচেতন ও আলোকিত মানুষের অন্তরেই তার দেশ ও জাতির কল্যাণ এবং সফলতার চিন্তাভাবনা এতটা জায়গা করে নেয় যে, প্রতিক্ষণ, প্রতি মুহূর্তে সে তার জাতির কল্যাণ সাধনেই ব্যস্ত থাকে। শুধু তাই নয়, নিজ কর্মকাণ্ড, আগ্রহ-উদ্দীপনা ও বৈপ্লবিক চিন্তাধারার মাধ্যমে নিজ জাতির অনুভূতিহীন নিস্পৃহ নির্জীব মানুষগুলোর হৃদয়ে নয়া জীবনের প্রাণসঞ্চার করে এবং তাদেরকেও জাতির কল্যাণের প্রতিযোগিতায় অংশীদার করতে অস্থির হয়ে ওঠে। মূলত এটাই একজন সত্যিকার দেশপ্রেমিক ও সচেতন নাগরিকের পরিচয়। দেশমাতার কল্যাণে যারা কাজ করেছেন, সংগ্রাম করেছেন, তারা এই চরিত্রেরই অধিকারী ছিলেন। নিজেদের হৃদয়ের সুপ্ত চেতনার বারুদ দিয়ে যারা প্রাণে প্রাণে আগুন জ্বেলেছেন।

## আগামী দিনে হিন্দুস্তানের দৃঢ়প্রত্যয়

শিক্ষা-সভ্যতা ও সমৃদ্ধির এই দৌড় প্রতিযোগিতায় আমাদের হিন্দুস্তানও পিছিয়ে নেই। সেও নিজের যোগ্যতা, সক্ষমতা ও সমৃদ্ধির ঝলক দেখাতে দৃঢ়প্রত্যয় গ্রহণ করেছে। কারণ, হিন্দুস্তান খুব ভালো করেই জানে যে, চলমান বিশ্বপরিস্থিতির প্রতি লক্ষ রেখে যদি সে নিজেকে সক্ষম করে গড়ে

তুলতে সচেষ্ট না হয়, তাহলে উন্নত ও ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রগুলো তাকে পদপিষ্ট করে সামনে এগিয়ে যাবে।

তখন সমৃদ্ধিশালী ও উন্নত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে থেকে নিজের উন্নয়নের আশা করা কিংবা পৃথিবীর নেতৃত্ব দেওয়ার স্বপ্ন দেখা তার জন্য মরীচিকার মতোই হবে। যা তাকে প্রতিনিয়ত ধোঁকা দিতে থাকবে। মহান আল্লাহও কাউকে এমন আত্মপ্রবঞ্চনায় দেখতে পছন্দ করেন না। তাই অত্যন্ত অপরিহার্য ও অনস্বীকার্য বিষয়গুলো থেকে কেউ যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় কিংবা তা পালনে অলসতা করে, তাহলে তিনি দুনিয়াতেই তাকে লাঞ্ছনা-বঞ্চনার কঠিন শাস্তি ভোগ করান। পদে পদে অপমান আর অপদস্থতাই হয় তার নিত্যসঙ্গী। পৃথিবীর ক্ষমতা ও প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলোর দাস হয়েই তাকে বেঁচে থাকতে হয়। বলুন, এমন জীবনের কীই-বা মূল্য আছে?

## কুদরতি শাস্তি

মহান কুদরতের পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে নিয়ম হলো, তিনি নিজের অবাধ্য বান্দাদের ক্ষমা ও ছাড় দেওয়ার জন্য নিজের হৃদয়ে সামান্যতম দয়া-অনুগ্রহও পোষণ করেন না।[১] জুলুম-নিপীড়নের এই রক্তাক্ত ভূমিতে যে ক্ষমতাধর ও প্রভাবশালীর এক আঙুলের ইশারাতেই অসংখ্য নিরপরাধ মানুষ রক্ত ও মাটিতে গড়াগড়ি খায়; সেও কুদরতের ইনসাফপূর্ণ কঠিন ধরা ও তাঁর অপরিবর্তনীয় বিধানের অগ্নিগোলা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। পৃথিবীর এই ক্ষমতাবানদের হৃদয়েও কখনো কখনো দয়ার উদ্রেক হতে পারে; কিন্তু মহান কুদরতের বিধানকে যারা অস্বীকার করে, অবজ্ঞা করে, তাদের কখনো তিনি ক্ষমা করেন না। তিনি যেন এমন এক কঠিন শিক্ষক, যিনি নিজ ছাত্রদের কখনো সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত দেখে সহ্য করতে পারেন না। তিনি কখনো এটা মেনে নেন না যে, তাঁর অবাধ্য ছাত্ররা তাদের কৃতকর্মের সাজা ভোগ না করেই পার পেয়ে যাবে। আজাব ও শাস্তির ব্যাপারে তিনি নিজের যে নীতিমালা শুনিয়ে দিয়েছেন, তা থেকে কেউ রেহাই পাবে না। চাই সে বৃদ্ধ হোক বা যুবক, আলেম কিংবা জাহেল, রাজা কিংবা প্রজা। সৃষ্টিজীবের প্রতিটি অণুপরমাণু

---

১. যখন আল্লাহর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যায় ও বান্দা তওবা না করে, তখনের কথা উদ্দেশ্য। না হয় ইউনুস আলাইহিস সালামের জাতির ওপর শাস্তি আসার পর তওবা করার দ্বারা আল্লাহ শাস্তি তুলে নেন।-সম্পাদক

এমনকি প্রতিটি বিন্দুও তাঁর বিধানের অধীন। কোনো কিছুই তাঁর কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে না। যতক্ষণ না সে তাঁর বিধানের সামনে মাথানত করে।

যে বীজের ফসল উৎপন্ন হওয়ার শক্তি নেই, কুদরত তাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেন। তেমনই যে জাতির মধ্যে নিজেদের মানমর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তিকে টিকিয়ে রাখার সাহস নেই, কুদরত কখনো তাদের নেতৃত্বের আসনে বসান না। প্রদীপ তো সেই সময় পর্যন্তই আলো বিলানোর আশা করতে পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে আগুন জ্বালানোর ক্ষমতা থাকে। একটি বীজ তো তখনই উন্নতির প্রত্যাশা করতে পারে, যখন তার মধ্যে নিজেকে মাটিতে বিলীন করে অসংখ্য বীজ হওয়ার যোগ্যতা বিদ্যমান থাকতে দেখবে।

কোনো দেশ বা জাতি ততক্ষণ পর্যন্তই শিক্ষা ও সভ্যতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছার স্বপ্ন দেখতে পারে, অথবা নিজেদের অর্জিত গৌরবের স্থায়িত্বের আশা করতে পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই দেশ বা জাতির প্রতিটি সদস্য মহান কুদরতের বিধিবিধান ভুলে না গিয়ে হৃদয়ের গভীর থেকে তা মানার জন্য সদা প্রস্তুত থাকে।

## হিন্দুস্তানের যুবকদের প্রতি

যেকোনো রাষ্ট্রের উন্নতি ও সমৃদ্ধি নিহিত থাকে সেখানকার মানুষের উন্নতি ও সমৃদ্ধির ওপর। একটি জাতির উন্নতি তো তখনই হতে পারে যখন সে জাতির প্রতিটি যুবকই কর্মঠ ও পরিশ্রমী হবে। প্রভুপ্রদত্ত মেধাকে কাজে লাগিয়ে আপন জাতিকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নেবে। কিন্তু আফসোস! শত আফসোস! আমার প্রিয় হিন্দুস্তানের অধিকাংশ যুবকই আজ নিজেদের মহামূল্যবান সময়গুলোকে অহেতুক কাজে নষ্ট করছে। জুয়া, তাস, গাঁজা, আফিম, রং-তামাশা ও নাটক-সিনেমাতেই তারা হিরে-জহরত থেকেও দামি সময়গুলোকে ধূলিকণার মতো উড়িয়ে দিচ্ছে। অথচ তারা চাইলেই পারত ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিপতিত এই রিক্ত-নিঃস্ব জাতিকে সুখসমৃদ্ধি ও উন্নয়নের সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন করতে। নারীর সৌন্দর্য, কমনীয়তা ও ভালোবাসার রসে টইটম্বুর এমন সহজলভ্য বইপুস্তক পড়ে পড়ে একেকজন এখন 'প্রেমের শাহজাদা' হয়ে গেছে। না জানি কল্পনার রাজ্যে হারিয়ে গিয়ে কতগুলো রঙিন উপত্যকা প্রেমলীলার রঙিন মঞ্চ ও সবুজ-শ্যামল উদ্যান পাড়ি দিয়ে তারা আজ প্রেয়সীকে খুঁজছে। অলস মস্তিষ্কের উদ্ভাবিত সেসব গল্প-উপন্যাস তাদেরকে নারীর সৌন্দর্য আর প্রেম-ভালোবাসায় আকণ্ঠ

নিমজ্জিত করে রেখেছে। এমন অনর্থক চিন্তাভাবনা, জল্পনাকল্পনা ও চিত্তবিনোদনের রঙিন পৃথিবীকে অন্বেষণ করার পরিণতি হলো, তাদের হৃদয়ে দেশ ও জাতির জন্য ভালো কিছু করার চেতনার প্রদীপ তো থাকবে, কিন্তু তাতে সেই হৃদয়জ্বালা এবং মর্মপীড়া ও প্রেরণার আগুন থাকবে না। যে আগুন অনাকাঙ্ক্ষিত সেসব খড়কুটোকে জ্বালিয়ে ছাই করে দেবে, যা তাদের লক্ষ্যে পৌঁছার পথে বাধা সৃষ্টি করবে। তা ছাড়া প্রেম-ভালোবাসায় মজে থাকা মানুষদের কর্মস্পৃহা ও শক্তিসামর্থ্য এতটাই দুর্বল হয়ে পড়ে যে, জীবনযুদ্ধে অংশ নেওয়ার যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলে। যদি ভোগবিলাসে মত্ত এই আনন্দ-বিনোদনের গোলামরা নিজেদের হৃদয়ের ওপর জোর খাটিয়ে সাহস করে জীবনযুদ্ধের এই রণক্ষেত্রে এসেও যায়, তবুও তাদের এই উৎসাহ-উদ্দীপনা এতটাই সাময়িক হয় যে, তরবারি কোষমুক্ত হতেই তাদের হৃদয়ে কাঁপন শুরু হয় এবং দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পলায়ন করে।

পাখিদের কলকাকলি আর বিচিত্র ফুলেদের মন মাতানো সৌরভ যুবকদের চিন্তা-চেতনাকে এতটাই চিত্তবিনোদনের আশেক বানিয়ে রেখেছে যে, তাদের ধারণা জীবন মানে ফুলে ফুলে সুশোভিত এক নয়নাভিরাম বাগান, যেখানে কেউ ফুল হয়ে সুবাস ছড়ায় আর কেউ ভ্রমর হয়ে মধু আহরণ করে। ফুল তুলতে গিয়ে যে কত শত কাঁটার আঘাত সইতে হয়, তা যেন তারা বেমালুম ভুলে গেছে। অথচ সে কাঁটাও তো ফুলের শাখে ফুলের পাশে বিদ্যমান থাকে।

## বিনীত নিবেদন

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, যদি আপনারা মহাক্ষমতাশালীর আইন অস্বীকারকারী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হন, তাহলে আমি আপনাদের কাছে এই সতর্কবার্তা পৌঁছে দিতে চাই যে, বাহ্যিক চাকচিক্যে মোহগ্রস্ত হয়ে আপনারা চরম ক্ষতিকর এক ভুলের শিকার হয়েছেন। আজ আপনারা যে পথে চলছেন, সাবধান! সে পথের সৌন্দর্য দেখে বিমোহিত হবেন না। কারণ আজকের আলো ঝলমল এই পথ আপনাদের কোনো পুষ্পোদ্যানে নিয়ে যাবে না। বরং ধ্বংস ও বিনাশের এক ভয়ংকর কণ্টকাকীর্ণ ভূমিতে নিয়ে যাবে।

খুব ভালোভাবে এই বাস্তবতাকে বুঝতে চেষ্টা করুন। জীবন কোনো রঙিন স্বপ্নের নাম নয়, বরং কঠিন এক পথ। যেখানে প্রতিনিয়ত আপনাকে টিকে থাকার সংগ্রাম করতে হবে। এই জীবন কোনো কাগজের বুকে লেখা প্রিয়তমার সৌন্দর্যবর্ণিত কবিতা নয়, বরং বুলবুলিকে নিয়ে লেখা ভালোবাসার

এক হৃদয়বিদারক শিক্ষণীয় উপাখ্যান। মনে রাখবেন, আপনার এই জীবন কৈশোরের কোনো খেল-তামাশা নয়, বরং কর্মমুখর ব্যস্ত এক ময়দান। যেখানে প্রতিনিয়ত আপনাকে নিজের মেধা ও শ্রম ব্যয় করে কর্মের মাধ্যমে নিজের সক্ষমতা ও যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হবে এবং পৃথিবীর বুকে আপন অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

যদি আপনারা আলস্য ও কাপুরুষতার অভিশপ্ত শিকলে নিজেদের বন্দি করে ফেলেন, তাহলে এই বিশাল রণক্ষেত্র হতে বিজয়ী ও সফল হয়ে ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষাকেও নিছক কল্পনা বা স্বপ্নই ভাবতে পারেন। সাবধান! যদি এভাবেই চলতে থাকেন, তাহলে যে ভূমিতে আপনাদের বিজয়ের পতাকা ওড়ার কথা ছিল, সেই ভূমিতেই আপনারা রক্তমাখা লাশ হয়ে পড়ে থাকবেন। সেদিন আপনাদের এমন কাপুরুষোচিত মৃত্যুর জন্য কেউ কান্না করবে না।

সুতরাং সত্যিই যদি আপনারা জীবনকে ভালোবাসেন, নিজ জাতিকে ভালোবাসেন, তাহলে সৎসাহস ও দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে জেগে উঠুন এবং সময়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজেদের সমস্ত শক্তি জাতির কল্যাণে নিয়োজিত করুন।

কিন্তু আপনারা যদি মহান প্রভুর বিধানের সামনে মাথানত না করেন, তাঁর শিক্ষা ও আদর্শকে বুকে ধারণ না করেন, সর্বোপরি তাঁর দেওয়া দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী নিজেদের জীবন পরিচালনা না করেন, তাহলে মনে রাখবেন, এর পরিণাম এতটা ভয়ংকর হবে যে, আপনারা স্বপ্নেও তা ভাবতে পারবেন না।

মহান মালিকের সব বিধানই সুদৃঢ়। তাঁর বিধানের প্রতি কারও অবজ্ঞা-অবহেলাকে তিনি মোটেই সহ্য করেন না। তাঁর অপরিবর্তনীয় বিধান হলো, যদি তোমরা আমার বিধিবিধান অনুযায়ী আমল করো, আমার ইচ্ছানুসারে জীবনযাপন করো, তাহলে আমি তোমাদের মাটির এই বিছানা থেকে উঠিয়ে সুমহান আরশে পৌঁছে দেবো। আর যদি আমার বিধান অস্বীকার করো, আমার দেখানো পথে না চলো, তাহলে আমি তোমাদের সুউচ্চ আরশ থেকে জমিনের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করতেও দ্বিধা করব না।

### চিন্তার জাদুকরি প্রভাব

যেকোনো জাতির সফলতা ও ব্যর্থতা সে জাতির সদস্যদের সুদৃঢ় মনোবল, সুমহান চিন্তাভাবনা কিংবা কাপুরুষতার মধ্যেই নিহিত।

আগেকার দার্শনিকরাও এই বাস্তবতাকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে পৃথিবীর মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন যে, দুনিয়ার সব বিস্ময়কর কর্মকাণ্ড ও বৈপ্লবিক ঘটনাবলির গূঢ় রহস্য উন্নত হৃদয়ের সমুন্নত চিন্তাভাবনাতেই লুকিয়ে রয়েছে। আবার পৃথিবীর সমস্ত নিকৃষ্ট ও লজ্জাজনক কর্মকাণ্ডের মূল সংঘটকও হলো নিকৃষ্ট ও নির্লজ্জ চিন্তা-চেতনা। যা মানুষকে নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর জিনিসের দিকে ধাবিত করে। মানুষের সফলতা-ব্যর্থতাও তার চিন্তা-চেতনা, ধ্যানধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সম্পৃক্ত। কোনো মানুষের চিন্তাভাবনা যদি কাপুরুষতা ও দুর্বল মনোবলসম্পন্ন হয়, তাহলে তার পক্ষে যেমন এই জীবনযুদ্ধে বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় দেওয়া অসম্ভব, তেমনই সুদৃঢ় মনোবল ও সাহসের অধিকারী ব্যক্তিকে পরাজয় ও ব্যর্থতার গ্লানি আচ্ছন্ন করাও অসম্ভব। জয় ও ক্ষয়ের এই গুপ্তভেদ, সাহস ও ভয়ের এই গূঢ় রহস্য মানুষের চিন্তা-চেতনার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে।

মানবজীবনের প্রতিটি কর্মকাণ্ডই সেই ধ্যানধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে পরিচালিত হয়, আপন হৃদয়ে সে যা লালন করে। আজকের এই আধুনিক সমাজেও যারা জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়েছেন, হতাশা ও ব্যর্থতাকে দু-পায়ে মাড়িয়ে সফলতার রাজমুকুট ছিনিয়ে এনেছেন; তারাও পৃথিবীর সামনে এই চরম সত্যটি তুলে ধরেছেন যে, মানবজীবনের জয়-পরাজয়, সফলতা ও ব্যর্থতা, সচ্ছলতা ও দরিদ্রতা, সম্মান ও অসম্মান, সবকিছুই তার চিন্তাশক্তির প্রভাব ও ফলাফল, ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিকৃতি। তার দৃষ্টিভঙ্গি কখনো তাকে জয়ের হাসি উপহার দেয়, আবার কখনো পরাজয়ের গ্লানি। শুধু চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের কারণেই মানবজীবনে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন দেখা দেয়। মনে রাখবেন, যারা সবসময় হতাশায় ভোগেন, পরাজয়ের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকেন, তাদের এই ভয় ও হতাশা তাদেরকে আরও বেশি ভীতু, কাপুরুষ ও অলস বানিয়ে দেয়। ফলে তাদের পুরো জীবনটাই ব্যর্থতার কালোমেঘে ছেয়ে যায়। অন্যদিকে যারা সবসময় জয়ের নেশায় মত্ত থাকেন, সফলতা ও সার্থকতার সুউচ্চ শৃঙ্গে আরোহণের স্বপ্ন দেখেন, এই স্বপ্ন ও সাহস তাদের মধ্যে অসম্ভবকে সম্ভব করার দৃঢ়প্রত্যয়, উদার মনোভাব, তীক্ষ্ণ মেধা ও বিচক্ষণতা সৃষ্টি করে। যা পরবর্তী সময়ে তাদের জীবনে সফলতার জ্যোতির্ময় চাঁদ হয়ে উদিত হয়।

প্রতিটি মানুষ আপন হৃদয়ে যে চিন্তা-চেতনা লালন করে, সেই চিন্তা-চেতনাই তাকে সবসময় সেরকম পরিবেশ-পরিস্থিতির দিকে আকর্ষণ করতে থাকে এবং তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ-পরিস্থিতি খুঁজে দেয়। এই কারণেই প্রত্যেক

মানুষের জীবনযাপন, চলাফেরা, স্বভাবচরিত্র ও কর্মকাণ্ড দেখেই তার রুচিবোধ ও মানসিকতা সম্পর্কে জানা যায়।

আমাদের জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতার মধ্যে যে চিন্তাভাবনার কতটা প্রভাব রয়েছে, স্বভাবচরিত্র ও অভ্যাসের আড়াল থাকায় আমরা তা অনুধাবন করি না। আমরা মনে করি, অমুকের এই সফলতা বা ব্যর্থতা তো তার নিজস্ব কর্মকাণ্ড, চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও স্বভাবচরিত্রেরই ফসল। অথচ এর পেছনে রয়েছে চিন্তা-চেতনার বেশ প্রভাব।

**ইচ্ছাশক্তি**

কুদরতিভাবে প্রতিটি মানুষের মন-মস্তিষ্কেই ইচ্ছাশক্তিকে আমানত রাখা হয়েছে। তবে তার আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা আশেপাশের পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রভাব ও স্বীয় জীবনের অভিজ্ঞতারই অনুগামী হয়। তরমুজ যেমন তরমুজের রং গ্রহণ করে, তেমনই একজন মানুষকে দেখেই অপরজন নিজের রুচি-প্রকৃতিকে সাজাতে থাকে।

দুধপানের প্রাথমিক দিনগুলোতে প্রতিটি শিশুরই রংঢংহীন এক কোমল হৃদয় থাকে। সে জানে না তাকে কীভাবে চলতে হবে; কীভাবে বলতে হবে, পরবর্তী সময়ে সে যেমন পরিবেশ-পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, সেটার প্রভাবই তার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে যায়। ঠিক তেমন, যেমন কোনো সাদা কাপড়কে আপনি যে রঙের পানিতেই ধৌত করবেন, তা সেই রঙেই রঙিন হবে। তদ্রূপ মানুষের হৃদয়ে যে চিন্তা-চেতনা বসবাস করে, তার আলোকেই মানুষের স্বভাবচরিত্র গড়ে ওঠে এবং জীবনমঞ্চে সে সেরকম অভিনেতাই হয়ে থাকে।

মানুষের স্বভাবচরিত্রের পরিবর্তন তার চিন্তা-চেতনারই ফসল। এই কারণেই কারও অভ্যাসের পরিবর্তন আনতে চাইলে তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে দিন। দেখবেন, তার অভ্যাসের মধ্যেও পরিবর্তন এসে গেছে। শুধু তাই নয়, এতে করে মানুষের পরিবেশ-পরিস্থিতিতেও পরিবর্তন আসে। আমি, আপনি, আমরা সবাই যদি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে পারি, তাহলে দেখবেন আমাদের সমাজের অবস্থাও পরিবর্তন হয়ে গেছে। তবে হ্যাঁ, খুব সহজে এই পরিবর্তন সাধিত হবে না। কেননা, মানুষের চিন্তা-চেতনা সহজে পালটায় না, যতক্ষণ না তার গায়ে কোনো বিপ্লবের ছোঁয়া লাগে। এর জন্য চাই প্রচুর পরিশ্রম ও সুদৃঢ় মনোবল। সৎসাহস ও চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমেই মানুষ নিজেদের হীন জীবন থেকে বের হয়ে মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করতে সক্ষম হয়।

**বইপুস্তক অধ্যয়নের গভীর প্রভাব**

মানুষের সমুন্নত চিন্তাভাবনা ও নিচু মানসিকতা তৈরির ক্ষেত্রে যেমন সংশ্রবের প্রভাব থাকে, তেমনই বইপুস্তক অধ্যয়নও মানুষের হৃদয়ে বেশ প্রভাব ফেলে। বন্ধুবান্ধবদের সোহবত-সংশ্রবের মাধ্যমে যেমন মানুষের স্বভাবচরিত্র সম্পর্কে জানা যায়, তেমনই প্রত্যেক মানুষকেই তার গ্রন্থ অধ্যয়নের মাধ্যমে চেনা যায়। যে ধরনের বইপুস্তকের বিষয়াদি তার অন্তরে রেখাপাত করে, তার আলোকেই তার মন-মানসিকতা গড়ে ওঠে। তবে হ্যাঁ, বড় কোনো প্রভাববিস্তারকারী কিছু যদি তার হৃদয়ে প্রভাব ফেলে, তাহলে তা ভিন্ন বিষয়। তাই বইপুস্তক নির্বাচনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেওয়া উচিত।

নোংরা ও অশ্লীল বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা বইপুস্তক মানুষের হৃদয়ে শুধু নোংরামি আর অশ্লীলতার বীজই বপন করে। পরবর্তী সময়ে তার মন-মানসিকতায় যতই পরিবর্তন আসুক না কেন, সে যতই সুস্থ, সুন্দর ও পবিত্র চিন্তার অধিকারী হোক না কেন, বাহ্যিকভাবে যদিও তখন পুরোনো সেই বাজে বইপুস্তকের প্রভাব অনুভব হবে না; কিন্তু এটা এক চরম সত্য যে, এই ধরনের বইপুস্তকের প্রভাব কখনো মানুষের মন থেকে মুছে যায় না। বরং সময়ে সময়ে নিজের অস্তিত্বের জানান দিতে থাকে। অন্য কোনো দৃষ্টিভঙ্গির অধিক প্রভাবের কারণে হয়তো তা সাময়িক দমে যায়, কিন্তু চিরতরে ধ্বংস হয়ে যায় না।

প্রিয় পাঠক, মনে রাখবেন, মানুষের চিন্তা-চেতনা যেমন আগুন আর বিজলি থেকেও ভয়ংকর, তেমনই মানুষের শক্তি-সাহসের জন্যও উপকারী। বিবেক-বোধকে কাজে লাগিয়ে যদি হৃদয়কে ভালো চিন্তাভাবনার ভান্ডার বানানোর চেষ্টা করা হয়, তাহলে তা নিচু থেকে নিচুতর মানুষকেও সম্মানের স্বর্ণশিখরে পৌঁছে দেবে। কিন্তু যদি সুস্থ সুন্দর ও পূতপবিত্র চিন্তাভাবনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া হয়, হৃদয়কে সব ধরনের নাপাক ও নোংরা চিন্তাভাবনায় পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে তা সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী একজন মানুষের চরিত্রেও দাগ লাগাতে দ্বিধা করবে না।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, মানুষের জীবনে যেহেতু চিন্তাভাবনা ও ধ্যানধারণার জাদুকরি প্রভাব রয়েছে; তাই নিজেদের ধ্যানধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে উদাসীন হওয়া যাবে না। আমাদের জীবনের বাঁকে বাঁকে সেই চিন্তা-চেতনাগুলো গভীরভাবে রেখাপাত করে থাকে; যেগুলো আমরা আমাদের

বন্ধুবান্ধব ও বইপুস্তক থেকে গ্রহণ করি। তাই আসুন, বন্ধু ও বই নির্বাচনে আমরা সচেতন হই।

এই কথা যদি সত্য হয় যে, যেকোনো জাতির দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা পরিবর্তনের মধ্যেই তাদের কল্যাণ ও মুক্তি নিহিত, তাহলে হিন্দুস্তানের যুবকদের প্রতি আমার দরদি আহ্বান, আসুন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অলস মস্তিষ্কের লেখকদের কাল্পনিক গালগল্প, প্রেমকাহিনি ও বাস্তববিরোধী কিচ্ছা-কাহিনি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সেসব বইপুস্তক অধ্যয়ন করি, যেখানে রয়েছে আমাদের পূর্বসূরিদের সাহসিকতার গল্প। হার না মানার গল্প, প্রজ্ঞা ও প্রত্যয়ের গল্প। যেখানে লেখা রয়েছে জীবনের চড়াই-উতরাই পাড়ি দিয়ে কীভাবে সামনে যেতে হয় সে কাহিনি। যে বইয়ের পরতে পরতে রয়েছে আলস্যের ঘুম ভেঙে জেগে ওঠার গল্প। যে বই পাঠে প্রাণচাঞ্চল্য ও উদ্যম সৃষ্টি হয়। মনে রাখবেন, সে লোক প্রকৃত শিক্ষিত নয়, যার পেটে হাজারো বইপুস্তকের লাইব্রেরি রয়েছে কিংবা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বইপুস্তক যার মুখস্থ। প্রকৃত শিক্ষিত তো সে, যে নিজের জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করতে পারে। শিক্ষার্জন ও শিক্ষাদানে আপনি আপনার পুরো জীবন ব্যয় করলেন, অথচ নিজের জীবনে সেই শিক্ষার আলো জ্বালাতে পারলেন না, তাহলে তো আপনার দৃষ্টান্ত হবে সেই সম্পদশালীর ন্যায়, যে নিজের ধনসম্পদকে দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য ব্যয় করে দেওয়ার স্লোগান দেয়, অথচ সেই সম্পদ ব্যয় করে সে নিজেই উপকৃত হতে পারল না। উলটো অসংখ্য আক্ষেপ আর দীর্ঘশ্বাস বুকে নিয়ে কবরবাসী হয়ে যায়।

ধরে নিন, সততা ও আমানতদারি বিষয়ে আপনি এমন একটি প্রবন্ধ তৈরি করলেন, দীর্ঘসময় পর্যন্ত দেশের পত্রপত্রিকাগুলো যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকল। কিন্তু আপনার প্রতিদিনের যাপিত জীবনে সততা ও আমানতদারির লেশমাত্রও নেই। বলুন, তাহলে এমন প্রবন্ধ লিখে কী হবে? একটি রাষ্ট্রের কবি-সাহিত্যিক, লেখক-কলামিষ্ট, বুদ্ধিজীবী, অভিনেতা ও গল্পকারের এতটা প্রয়োজন নেই, যতটা প্রয়োজন রয়েছে সেসব মানুষের, যাদের সুদৃঢ় মনোবল, দৃঢ়প্রত্যয় ও কর্মমুখর জীবন মানুষের জন্য উত্তম আদর্শ হবে।

প্রতিটি মানুষকে প্রথম যে যোগ্যতাটি অর্জন করতে হবে, তা হলো আত্মার পরিশুদ্ধি ও উত্তম চরিত্র। এরপর অন্যান্য যোগ্যতা অর্জনের প্রতি মনোনিবেশ করা উচিত। কিন্তু আফসোস! আজকের এই পৃথিবী সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে। নদী এখন ভিন্ন স্রোতে প্রবাহিত হচ্ছে। অন্যকে উপদেশ

দেওয়ার মতো মানুষের তো অভাব নেই। কিন্তু নিজেকে উপদেশ দেওয়ার মানসিকতা কজনের আছে?

ফলাফল হলো, বর্তমানে আমাদের সমাজে সবাই বক্তা, সবাই উপদেশদাতা, অন্যকে উপদেশ দেওয়া ছাড়া যাদের আর কোনো কাজ নেই। এমনকি আজকাল তো অনেকে বাক-পটুতার মাধ্যমেই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করছে। বয়ান-বক্তৃতাকে নিজের অর্থোপার্জনের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করছে। দেশ ও জাতির অনিবার্য ধ্বংসই হলো যার পরিণাম ফল। বাস্তবেই যারা জীবনের প্রকৃত সুখ পেতে চায়, জীবনের মানেটা বুঝতে চায়, তাদের জন্য ইলমের চেয়েও আমলের প্রতি অধিক মনোনিবেশ করা বেশি জরুরি।

তাই আসুন, আমরা আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই যে, নিজেদের দিল-দেমাগ ও দেহের সব শক্তি ব্যয় করে একটি আমলি জীবনযাপন করার চেষ্টা করব। এমন জীবন গঠন করব, যেখানে হয়তো শিক্ষার অভাব থাকবে, কিন্তু ভালো কাজের দিক দিয়ে হবে পরিপূর্ণ। যে জীবন সততা ও সত্যবাদিতা থেকে একচুলও পিছু হটবে না। যতদিন বেঁচে থাকব দুনিয়ার মানুষের দৃষ্টিতে না হোক, আল্লাহর দৃষ্টিতে একজন বীরবাহাদুরের মতোই জীবন অতিবাহিত করব। যেদিন মৃত্যু সামনে আসবে, সেদিনও যেন একজন বীরের ন্যায় মরতে পারি।

উত্তম চরিত্র ও সৎস্বভাব মানবজীবনের এমন এক বিরল মহামূল্যবান সম্পদ, যার অন্বেষণই মানুষের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত। পূতপবিত্র মনীষীদের জীবনী পাঠ এবং তাদের শিক্ষা অনুযায়ী কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমেই ভালো কাজের আগ্রহ ও হৃদয়ের পবিত্রতা অর্জন হয়। তাই আসুন, আমরা পৃথিবীর ভালো মানুষদের জীবনী পাঠ করি। ভালো মানুষদের সংশ্রবে যাই এবং ভালো মানুষ হওয়ার চেষ্টা করি।

## পৃথিবীর মহিমান্বিত মনীষীদের জীবনী

আমার এমন চিন্তাভাবনার কারণেই আমি পৃথিবীর সেসব ক্ষণজন্মা মহান মহিরুহের জীবনী লেখার ইচ্ছা করেছি, যারা পৃথিবী থেকে অজ্ঞতার আঁধার দূরীভূত করে শিক্ষা ও সভ্যতার আলো জ্বালিয়েছেন। আদর্শিক প্রশ্নে জীবনের সব সুখ-আহ্লাদ ও লোভ-লালসাকে নির্দ্বিধ প্রত্যাখ্যান করে বিসর্জন দিয়েছেন।

হাতেগোনা সেই মনীষীদের মধ্যে পুরো বিশ্বজগতের জন্য রহমত, গুনাহগারদের জন্য সুপারিশকারী, নবী-রাসুলদের সর্দার, সর্বশেষ নবী, সমস্ত সৃষ্টিজীবের নেতা ও গৌরব মুহাম্মাদ মুস্তফা আহমাদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও সতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী। তাই আমি প্রথম এই মহান মনীষীর জীবনী লেখার গৌরব অর্জন করার চেষ্টা করেছি। সম্ভবত আমার নিজ ধর্মেরই অনেক সাম্প্রদায়িক ও সংকীর্ণমনা লোক এই কথা বলে নাক সিটকাবে যে, নিজের ধর্মের প্রসিদ্ধ দেবদেবী আর মুনিঋষিদের বাদ দিয়ে কেন আমি মুসলিমদের নবীর জীবনী লেখার ইচ্ছা করলাম? মূলত আমার কাছে এমন প্রশ্নের কোনো যৌক্তিকতাই নেই। আমার মতে এই ধরনের প্রশ্ন চরম সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণ মানসিকতার দুঃখজনক বহিঃপ্রকাশ ছাড়া কিছুই নয়।

সুমহান মর্যাদার অধিকারী ক্ষণজন্মা মহিরুহরা এই পৃথিবীতে কোনো নির্দিষ্ট জাতি বা গোত্রের নয়। ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকলের জন্যই তাদের সম্মান করা ফরজ এবং তাদের শিক্ষার আলো গ্রহণ করে নিজেকে ধন্য করা আবশ্যক। এই মনীষীরা নিজেদের উদার দৃষ্টিভঙ্গির কারণে আপন আপন শিক্ষার অপার বারিধারায় প্রতিটি মানবহৃদয়কে ঠিক তেমনই সিক্ত করার চেষ্টা করেছেন, অবিরত বারিধারার সজীবতায় শুকনো মরূদ্যান যেমন ফুলে ফুলে ভরে যায়। আমরা এমন সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার পরিচয় কেন দেবো যে, এমন একজন মহান মনীষীকে একটি বিশেষ জাতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেবো এবং নিজেরা তাঁর সুমহান শিক্ষার আলো হতে বঞ্চিত থাকব? প্রত্যেক মানুষকেই সত্যের অনুসারী হতে হবে। কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের পূজারি নয়। ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের কথা তো তখনই অনুসরণযোগ্য হবে, যখন তা সত্যের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হবে। অনেক মানুষ যেমন নিজেদের মাজহাব বা সম্প্রদায়ের বড় বড় নেতা ও মনীষীদের প্রতি অগাধ ভক্তি ও বিশ্বাসের দরুন এমন অনেক গুণাবলি যুক্ত করে, যা তাদের কস্মিনকালেও ছিল না, তদ্রুপ আজকাল এমন মানুষও রয়েছে, যারা মনে করে আমাদের মতাদর্শের নেতা বা মনীষীরা যা বলেছেন, তা-ই সঠিক, অন্যসব ভুল।

প্রিয় ভাই, এটা তো সত্যের পূজা হলো না। একে তো ব্যক্তি বা দলপূজা বলে। একটি বিষয় খুব ভালোভাবে স্মরণ রাখবেন, পূর্বেকার নবীদের গ্রন্থাবলিতে এমন অনেক বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে, আজকের পৃথিবীতে যা আমলযোগ্য নয়। এখন কোনো ব্যক্তি যদি এমন কোনো নবীর শিক্ষা ও আদর্শকে আজ ও আগামীর পৃথিবীতে বাস্তবায়ন করার স্বপ্ন দেখে, তাহলে তা

দুঃস্বপ্ন ছাড়া কিছুই নয়। এতে করে সেই নবীর সত্যতার ওপর কোনো আঘাত আসবে না। কারণ, তার শিক্ষা ও আদর্শ তো তার সময়ের লোকদের জন্য উপযোগী ও আমলযোগ্য ছিল। কিন্তু এখন সময়ের পরিবর্তন হয়েছে, পৃথিবী বদলে গেছে। মানুষের নৈতিক ও মানসিক চিন্তা-চেতনাতেও বড় ধরনের বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। তাই আজ কী করে পূর্বেকার সেই নবীদের শিক্ষা ও আদর্শ মানুষের হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে প্রশান্তি দিতে পারে? এমন মহান ব্যক্তিদের শিক্ষা ও আদর্শকে রাবারের মতো টেনে টেনে আজকের এই পৃথিবীর চলমান শিক্ষা-সংস্কৃতির অনুগামী করার চেষ্টা করা সততা বিক্রির নামান্তর। সেই পূর্ববর্তী নবীদের মধ্যে প্রায় সব জাতি ও ধর্মেরই নবী-রাসুলগণ রয়েছেন। যাদের অনেক শিক্ষাদীক্ষাই বর্তমান পৃথিবীর উপযোগী নয়।

## বর্তমান যুগের হিন্দুস্তান বনাম জাহেলি যুগের আরব

প্রত্যেক মানুষেরই ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি থাকে, পছন্দ-অপছন্দ থাকে। এটা যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে আমার দৃষ্টিতে বর্তমান সময়ে আমাদের প্রিয় হিন্দুস্তানের সামনে যে মহান মনীষীর আদর্শ ও জীবনীকে পেশ করা যেতে পারে, তিনি হলেন নবী-রাসুলদের সর্দার মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

আজকের এই শিক্ষিত ও সভ্য হিন্দুস্তানের সঙ্গে যে জাহেলি যুগের আরবের কতটা গভীর সম্পর্ক ও মিল রয়েছে, তা আমাদের হিন্দুস্তানিদের জীবনব্যবস্থার দিকে তাকালেই স্পষ্ট হয়ে যায়। বলুন, আজকের এই হিন্দুস্তানে কি সভ্যতা, ভদ্রতা ও শালীনতার আইনকানুনকে ধনদৌলত ও অর্থোপার্জনের কামনা-বাসনার কসাইখানায় নির্দ্বিধায় জবাই করা হচ্ছে না? প্রকাশ্যে মদ্যপান করাকে কি শিক্ষিত ও সভ্য মানুষদের আনন্দ-বিনোদন বলে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে না? কুপ্রবৃত্তির কামনা ও পাশবিক চাহিদার নির্লজ্জ ঘটনাগুলোকে কি বন্ধুবান্ধবদের আড্ডায় উপস্থাপন করাকে গর্বের ও কৃতিত্বের বিষয় বলে ভাবা হচ্ছে না?

যুবতী নারীদের ফুলে ফুলে সুশোভিত যৌবনের বাগান, যেখানে নিষ্পাপ শিশুরা ফুল হয়ে ফোটে ও পাখি হয়ে খেলা করে। সিকান্দার বাদশার রাজত্ব আর কারুনের অঢেল সম্পদও যার মূল্য হতে পারে না। একমাত্র পবিত্র ভালোবাসা ও মায়া-স্নেহই হতে পারে যার সমমূল্য। যে নারীর সতীত্ব ও ভালোবাসা পেতে হলে সম্পদ নয়, চাই ভালোবাসা, ভালোবাসা এবং

ভালোবাসা। প্রেম ভালোবাসা দিয়েই এই বাগান থেকে ফুল তুলে নিতে হয়। আহা! আজ কি সেই মহামূল্যবান বাগানকে সোনারুপার দু-একটি টুকরার বিনিময়ে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে না? এমন অমূল্য রতন মেয়েদের কি পিতারা ঘটা করে মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে এমনভাবে বিক্রি করছে না, যেভাবে পশুর হাটে গরু-ছাগল বিক্রি হয়? একজন সুন্দরী রমণী কি কয়েকজন পুরুষের কামনা-বাসনার শিকার হচ্ছে না? দুঃখজনক হলো, তাদের মধ্যে এমন অনেক ধর্ষিতাও রয়েছে, ধর্ষক যাদের পূর্বপরিচিত, আত্মীয় বা সম্মানিত কেউ। যে বন্ধুরা আমার এই কথাকে অতিরঞ্জন মনে করছেন, তারা পাঞ্জাবের পল্লিবাসীদের নিয়ে একটু গভীরভাবে চিন্তা করুন। শতকরা ২৫টি ঘটনা যদি এমন না হয়, তাহলে বুঝে নেবেন যে, নিঃসন্দেহে আমি বাড়িয়ে বলছি। শহরের অবস্থা তো আরও খারাপ। বড় বড় জমিদারদের মধ্যে তো এই কথার প্রচলন আছে যে, পরিবারের একজন ছেলের বিয়ে হওয়া মানে ঘরের সব ছেলের বিয়ে হওয়া।[২]

---

২. স্বামীজির এমন কথায় আমিও চমকে গিয়েছিলাম। আমার চমকে যাওয়ার কারণ হলো, তিনি এখানে যে সময়ের অবস্থার কথা তুলে ধরেছেন, তা আজ থেকে প্রায় ৯০ বছর পূর্বের সময়কার অবস্থা, ভাবছি তখনও কি আমাদের এই হিন্দুস্তানের এমন করুণ চিত্র ছিল? আজকের এই আধুনিক ভারতে নারীদের অবস্থা যে কতটা শোচনীয়, সে বিষয়ে আমরা কমবেশি সবাই অবগত। তবুও সুহৃদ পাঠকদের কাছে বিষয়টি আরও সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরার জন্য আমি এখানে কিছু তথ্য উপস্থাপন করছি। বিভিন্ন সময়ে দৈনিক পত্রিকাগুলোর প্রতিবেদনে উঠে আসা সেসব তথ্য যেকোনো বিবেকবান মানুষকে ভাবিয়ে তুলবে।

এখানে যে বিষয়টি নিয়ে তিনি আলোচনা করছেন, সেই বিষয়ে গত ২০১৫ সালের শেষের দিকে দৈনিক *নয়াদিগন্ত* পত্রিকা একটি প্রতিবেদন ছেপেছে। সেখানে তারা লিখেছে, ভারতজুড়ে ২০১৫ সালে ৩৪ হাজার ৬৫১টি ধর্ষণমামলা দায়ের হয়েছে। ভারতের ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। তারা জানিয়েছে যে, ধর্ষণের শিকার নারীদের বয়স ৬-৬০ এর মধ্যে। তবে ১৮-৩০ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে এই হার বেশি। ১৭ হাজারই এই বয়সসীমার মধ্যে। তারা আরও জানায়, নথিবদ্ধ ৩৪ হাজার ৬৫১টির মধ্যে ৩৩ হাজার ৯৮টির ক্ষেত্রেই ধর্ষক সেই নারীর পূর্বপরিচিত, আত্মীয় বা কাছের কেউ। শতকরা হিসাবে বিষয়টি দাঁড়ায় ৯৫ দশমিক ৫ শতাংশ।

পাঠকদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, প্রতি বছরই ভারতে ধর্ষণের শিকার নারীদেরও সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। হিন্দুস্তান টাইমসের বরাতে দৈনিক *নয়াদিগন্ত* পত্রিকা এরপরের বছরও এই ধরনের আরেকটি খবর ছেপেছে। ২৪/১২/১৬ খ্রি. তারিখের সেই প্রতিবেদনে তারা লিখেছে, এই বছর ২০১৬ তে শুধু দিল্লিতেই ২ হাজার গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে, সারা ভারতের অবস্থা যে কতটা খারাপ, তা এই প্রতিবেদন থেকে সহজেই অনুমান করা যায়।

গবেষকদের মতে সারা পৃথিবীতে নারীদের জন্য সবচেয়ে অনিরাপদ দেশ হলো ভারত। জাহেলি যুগের আরবের সঙ্গে আজকের এই আধুনিক ভারতের যে কতটা মিল রয়েছে, তা আমার সুহৃদ পাঠকের কাছে আরও সুস্পষ্ট করার জন্য কিছু তথ্য আমি তুলে ধরছি।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, বলুন, নীতি-নৈতিকতাহীন এই বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করলেও কি মানবতার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে না? স্বয়ং লজ্জা শরমও বোধ হয় লজ্জায় মাথানত করে ফেলে। বিশ্বাস করুন, এই কথাগুলো লিখতে গিয়ে বারবার আমার কলম কেঁপে উঠছে। দুচোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েছে। আহা আমার হিন্দুস্তান! প্রিয় হিন্দুস্তান! তোমার গর্ভে তুমি এ কেমন দুশ্চরিত্র ও পাপিষ্ঠ সন্তানদের জন্ম দিয়েছ?

## চৌদ্দশ বছর পূর্বের ইয়াসরিবের[৩] চাঁদ

আজ থেকে চৌদ্দশ বছর পূর্বে জুলুম-নিপীড়ন ও নিকৃষ্ট কাজের এমনই এক ঘুটঘুটে অন্ধকার ইয়াসরিবের আকাশ ছেয়ে গিয়েছিল। কোথাও কোনো আলো ছিল না। ছিল না কোনো জোনাকি। ইয়াসরিবের দিগন্ত আলোকিত করে হঠাৎ একদিন উদিত হলো এক মায়াবী চাঁদ। যে চাঁদ নিজের অত্যুজ্জ্বল আলো দিয়ে আরব-উপদ্বীপের প্রতিটি বালুকণাকে জ্যোতির্ময় করে দিলো।

---

গত ৭/৪/২০১২ খ্রি. তারিখে দৈনিক *আমার দেশ* পত্রিকা অত্যন্ত বেদনাদায়ক একটি খবর ছেপেছিল। রিপোর্টারের নাম ছিল ইলিয়াছ হোসেন। প্রতিবেদনটির শিরোনাম ছিল এ রকম, ভারতে নীরব গণহত্যার শিকার মেয়ে শিশুরা। এক দশকে ১ কোটি মেয়ে পরিত্যক্ত, দুই দশকে ২০ লাখকে পিটিয়ে হত্যা।

নিজের এই প্রতিবেদনে তিনি লিখেছেন, ভারতে কন্যাশিশুকে বিবেচনা করা হয় অবাঞ্ছিত শিশু (আনওয়ান্টেড গার্ল) হিসাবে। গত এক দশকে অন্তত ৮০ লাখ কন্যাশিশুর ভ্রূণ (গর্ভের শিশু) হত্যা করা হয়েছে ভারতে। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর অন্তত ৫ কোটি কন্যাসন্তানের ভ্রূণ হত্যা করা হয়। গবেষকরা বলেছেন, বর্তমান পৃথিবীতে যুদ্ধ, ক্ষুধা, মহামারি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে যত লোক মারা যায়, তারচেয়ে অনেক বেশি কন্যাশিশুকে হত্যা করা হয় ভারতে। একে গবেষকরা 'সাইলেন্ট জেনোসাইড' বা নীরব গণহত্যা বলে মন্তব্য করেছেন।

কোনো কন্যাশিশু যদি সৌভাগ্যবশত পৃথিবীর আলো দেখতে পায়, তার জন্য অপেক্ষা করে আরও নির্মমতা, অনেক সময় তাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। যদি পিতামাতা সহৃদয়বান হয়ে থাকে তাহলে মেয়েটার অবস্থান হয় রাস্তা কিংবা ডাস্টবিনের পাশে। মা-বাবা তাকে নিজ হাতে হত্যা করে না। এই কারণেই গবেষকরা বলেছেন, কন্যাশিশুর জন্য ভারত পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ানক রাষ্ট্র।

ভারতের টিভিচ্যানেল এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, ভারতে এক বছর থেকে পাঁচ বছর বয়সী কন্যাশিশুদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ছেলে শিশুদের চেয়ে অন্তত ৭০% কম। ভারতের মধ্যেপ্রদেশ ও রাজস্থানের মতো দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চলে হরহামেশাই ঘটছে এমন হত্যার ঘটনা।

প্রিয় পাঠক, বলুন, একে আপনি কী বলে অভিহিত করবেন? জাহেলিয়াতের ঘরে ফেরা না অন্য কিছু?-অনুবাদক।

৩. **ইয়াসরিব :** বর্তমান নাম মদিনা মুনাওয়ারা। ইসলাম আগমনের পূর্বে এই শহরটির নাম ছিল ইয়াসরিব (يثرب)।-সম্পাদক

আহ! আমার প্রিয় মাতৃভূমি হিন্দুস্তানও আজ প্রায় সেই অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে। সেই সময় ব্যাপকভাবে মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল, আজকাল তো মূর্তি ও ব্যক্তি, দুটিরই পূজা-অর্চনা হচ্ছে। সেই সময় হিংস্র পশুর ন্যায় একজন মানুষ অন্য মানুষের ওপর আক্রমণ করত। অন্যের রক্তপিপাসায় কাতর থাকত। এখন তো মানুষ নিজের মিষ্টি মিষ্টি কথা, বাহ্যিক মায়া-মহব্বত ও প্রেম-ভালোবাসার ছুরি দিয়েই অন্যকে জবাই করার চেষ্টা করছে।

সেই সময় কারও অন্যায়-অপরাধ ও দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে বলা হলে পরস্পরের মনোমালিন্য হতো, মান-অভিমান হতো, কখনো বা মারামারি-হানাহানি হতো। আর আজ? আজ তো অন্যের দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে মুখ খোলা দূরের কথা, ভালো মানুষদের নেক কাজ, দুনিয়াবিমুখতা, তাকওয়া-পরহেজগারি ও সভ্যতা-ভদ্রতার ওপরই হামলা হচ্ছে। মানুষের সচ্চরিত্র ও নীতি-নৈতিকতা নিয়ে উপহাস করা হচ্ছে। এখন তো মানুষের ভালো মানুষিটাই তার সবচেয়ে বড় অপরাধ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সেই সময় মূর্তির নাম বিক্রি করে পুরোহিতরা নিজেদের পেট চালাত। আর এখন? এখন তো আল্লাহ-রাসুল, দেবদেবী, দ্বীনধর্ম, দল, মত, রাজনৈতিক পার্টি, সামাজিক সংগঠন, এতিমখানা, মিশনারি বা তাবলিগি কর্মকাণ্ড, মসজিদ-মন্দির ও সভাসমাবেশ প্রভৃতি কতক চতুর লোক নিজেদের কামাই-রোজগারের মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছে।

আহা! আল্লাহর ইবাদত করার মতো লোক তখনও ছিল না, তাঁর বিশ্বাসের আঙিনায় অবনত হওয়ার মতো মাথা আজও নেই। তাঁকে ভালোবাসার লোক তখনও ছিল না, তাঁর ভালোবাসার গান গাওয়ার লোক এখনো নেই।

বর্তমানকালে হিন্দুস্তানের নীতি-নৈতিকতাহীন অবস্থা জাহেলি যুগের আরব জাতির শিক্ষা-সভ্যতা ও শালীনতাহীন অবস্থার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার কারণেই সেই মহান সংস্কারকের পবিত্র জীবন নিয়ে আলোচনা করা একান্ত জরুরি। আজ থেকে তেরোশ বছর পূর্বে জাহেলি যুগের আরবে নুর ও ঈমানের যে আলো তিনি ছড়িয়ে দিতে বিস্ময়করভাবে সফল হয়েছিলেন; তাঁর সেই পবিত্র আলো আজ আমাদের হিন্দুস্তানেরও বড় প্রয়োজন!

এই গ্রন্থে আমি শুধু প্রিয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবন নিয়েই আলোচনা করব। সম্ভব হলে আগামী দিনে এমন কোনো রচনা লিখব, যেখানে তাঁর সেসব বুদ্ধিদীপ্ত ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষা-উপদেশ নিয়ে আলোচনা থাকবে, যার প্রতিটি শব্দই একেকটি প্রোজ্জ্বল মণিমুক্তা সমতুল্য। যার আলোক-রশ্মি কেয়ামত পর্যন্ত জ্বললেও এতটুকু হ্রাস পাবে না। আজকের

এই সময়ে তাঁর সেই মহামূল্যবান শিক্ষা ও উপদেশগুলোর প্রচার-প্রসার খুব বেশি জরুরি।

## আমার ব্যথা বোঝে যারা

আমার মনের দুশ্চিন্তা ও হৃদয়ের ব্যথা যারা বোঝেন, বোঝার চেষ্টা করেন, তারা জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হবেন যে, এই যে কিতাবটি আমি লিখেছি, তা আমি কোনো মুসলিম বন্ধুর সন্তুষ্টি কিংবা পার্থিব লোভ-লালসাকে সামনে রেখে যেমন লিখিনি, তেমনই দোজাহানের সর্দার, সৃষ্টিজগতের গৌরব, সকল নবীদের নেতা, সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ মুস্তফা আহমাদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (তাঁর ওপর আমার মাতাপিতা উৎসর্গ হোক)-এর ন্যায় এমন ক্ষণজন্মা মহামনীষীর উত্তম গুণাবলি বর্ণনা, তাঁর পবিত্র চরিত্রের প্রশংসা ও তাঁর জীবনের বৈপ্লবিক ঘটনাগুলোর পর্যালোচনা করার দুঃসাহস দেখিয়ে সেসব সংকীর্ণমনা সাম্প্রদায়িক লোকদের উত্তপ্ত আগুনে তেল ঢালাও উদ্দেশ্য নয়, যাদের হৃদয়ে হিংসা, শত্রুতা, সংকীর্ণ মানসিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার আগুন ইরানের অগ্নিশিখায়[৪] রূপ নিয়েছে।

এমন নিচু কাজে জড়িয়ে পড়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। নিজের হৃদয়ের আওয়াজকে, হৃদয়ের প্রতিটি শব্দকে আমি এমন বিরল মণিমুক্তা মনে করি, যা কোনো মূল্যেই আমি বিক্রি করতে প্রস্তুত নই। বন্ধুবান্ধবদের ভালোবাসা ও মায়া-মহব্বত আমার জীবনের এক রাজকীয় অধ্যায়, তা আমি অকপটেই স্বীকার করি। কিন্তু নিজের আদর্শ, নিজের বিশ্বাস ও বোধকে কোনো মানুষের বন্ধুত্ব ও ভালোবাসায় না কখনো বিক্রি করেছি, আর না আগামী দিনে কখনো করব।

## আমার এক দয়ার্দ্র বন্ধু

এই গ্রন্থ রচনার দৃঢ়সংকল্প করার পর এমন এক মুসলিম বন্ধুর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়, যার ধারাবাহিক তাগিদে খুব অল্প সময়েই গ্রন্থটি প্রকাশের মুখ দেখছে এবং এখন সুহৃদ পাঠকের হাতে হাতে পৌঁছে যাচ্ছে।

১৯২৯ সালের মে মাসের শুরুর দিকের কথা। যখন আমি দুনিয়ার বড় বড় নবী-রাসুলদের জীবনী লেখার সংকল্প করেছিলাম। সেদিনগুলোতেই অবিভক্ত পাঞ্জাব প্রদেশের প্রসিদ্ধ চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ, চিকিৎসা-বিষয়ক বহুগ্রন্থ প্রণেতা, খ্যাতিমান চিকিৎসক, গোল্ডমেডেলিস্ট, জনাব হাকিম মৌলভি

---

[৪]. ইরানের বিখ্যাত অগ্নিশিখা যা হাজার বছর ধরে প্রজ্বলিত ছিল।-সম্পাদক

মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ সাহেবের সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করি। কৃষি মন্ত্রী স্যার যোগিন্দর সিং-এর একটি কথা মনে পড়ে গেল। তিনি বলেছিলেন,

> মানুষের দৃষ্টিসীমার বাইরে এমন কোনো শক্তি রয়েছে, যিনি এমন এক বেড়ি বা শৃঙ্খল তৈরি করেছেন, যা ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও মতাদর্শের আবদ্ধদেরকেও বন্ধুত্ব, ভালোবাসা ও সম্প্রীতির এমন এক বন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলে, আজীবন যা অটুট থাকে। এমনকি তাদের অস্তিত্বও একে অন্যের বেঁচে থাকার জন্য আবশ্যক হয়ে পড়ে।

সাক্ষাতের পর আমার আর মাওলানা সাহেবের হৃদয়েরও এমন অবস্থা হলো। যতই আমরা একে অন্যের চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অবগত হচ্ছিলাম, ততই আমাদের হৃদয়-আত্মা পরস্পরের আরও কাছে চলে আসছিল। দেখাসাক্ষাতের ধারাবাহিকতায় আমাদের সম্পর্ক এই পর্যায়ে পৌঁছল যে, বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার বিচ্ছেদের যে যাতনা মানুষের হৃদয়কে পুড়ে পুড়ে কয়লা করে, সেই যাতনা থেকে আমরা যেন সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে গেলাম। একে অন্যের কাছ থেকে দূরে থাকলেও পরস্পরে ঠিক ততটাই কাছাকাছি থাকতাম, যতটা কাছে এই পৃথিবীতে খুব ভালো দুজন বন্ধু হতে পারে। দূরে থেকেও কাছে থাকার এই অম্লমধুর অনুভূতি আমাদের দুজনেরই হতো।

কোনো এক সাক্ষাতে আমি মাওলানা সাহেবের কাছে নিজের হৃদয়ের গোপন ইচ্ছার কথা জানাতে গিয়ে বললাম, খুব শীঘ্রই আমি পৃথিবীর বড় বড় নবী-রাসুলদের জীবনী লিখতে শুরু করব। আমার দৃষ্টিতে এ ক্ষেত্রে প্রথম আপনাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবনের ঈর্ষণীয় ঘটনাগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করাই বেশি উপযোগী মনে হচ্ছে। আমার কথা শুনে তিনি অত্যন্ত খুশি হলেন এবং আমাকে অভিনন্দন জানালেন। বিশেষ করে একজন অমুসলিম হয়েও মুসলিমদের নবীর পবিত্র খেদমতে নিজের ভালোবাসা ও বিশ্বাসের হাদিয়া পেশ করব বলে।

স্বাভাবিকভাবেই নিজ ধর্ম সব মানুষের কাছেই প্রিয় হয়ে থাকে। নিজের ধর্ম বা মতাদর্শের কোনো মহান মনীষীর জীবনের বাস্তব ও সত্য ঘটনাবলি নিয়ে নিজ ধর্মেরই কেউ যদি কোনো গ্রন্থ লিখে, তাতে মানুষ যতটা আনন্দিত হয়, তারচেয়েও বেশি খুশি হয় যখন অন্য ধর্মাবলম্বী কেউ এমন কাজ করে। এ কারণেই আমি আমার বন্ধুকে এই মানবিক স্বভাবমুক্ত মনে করছি না। তবে হ্যাঁ, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ ছাড়াও আমার প্রতি তার অকৃত্রিম ভালোবাসাও এই

আনন্দ প্রকাশের কারণ ছিল। বন্ধুর কোনো সফলতা বা প্রাপ্তিতে অপর বন্ধু যেমন আনন্দ প্রকাশ করে থাকে।

এই ঘটনা ঘটেছে আজ প্রায় চার বছর হতে চলল। সময় দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। কত জল গড়িয়ে গেল। নদীতে কত জোয়ারভাটা এলো গেল। অথচ সেই যে চার বছর পূর্বে সিরাতগ্রন্থ লেখার সংকল্প করেছিলাম তখন মাত্র কয়েক পৃষ্ঠা লিখেছিলাম। আজও সেই কয়েক পৃষ্ঠাই রয়ে গেছে। কারণ, মাঝখানের এই সময়টাতে আমি এমন এমন বিরূপ পরিস্থিতি ও প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন হয়েছি; পৃথিবীর কোনো মানুষ যার থেকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকতে পারে না। এই সংকট ও মুসিবতগুলো আমার জীবনটাকে ওলট-পালট করে দিয়েছে। এমতাবস্থায় আমার হৃদয়ে প্রিয় মুহাম্মাদের জীবনী লেখার যে আশা-আকাঙ্ক্ষা ধিকি ধিকি জ্বলছিল, আমার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া বিপদাপদের দমকা হাওয়ায় তা হয়তো কবেই নিভে যেত। কিন্তু আমার হৃদয়ের ছোট্ট কুটিরের সেই নিভুনিভু প্রদীপের সামান্য আলোটুকু অবশিষ্ট থাকার কারণ হলো সেই বন্ধুর হৃদ্যতা ও ভালোবাসাপূর্ণ চিঠি। কিছুদিন পরপরই যিনি চিঠি লিখে আমাকে আমার ইচ্ছা ও সংকল্পকে কাজে পরিণত করার তাগিদ দিতেন। প্রিয়জনের তাগাদা না থাকলে হয়তো প্রিয় মানুষটিকে নিয়ে লেখা এই প্রিয় গ্রন্থটি আজ পাঠকদের হাতে পৌঁছত না।

তার বন্ধুত্বপূর্ণ তাগিদ আর ভালোবাসার তাড়না চরম সংকটময় পরিস্থিতি ও প্রতিকূল অবস্থাতেও সব বাধাবিপত্তি ও সংকট কাটিয়ে উঠে আমাকে গ্রন্থটি রচনায় শক্তি জুগিয়েছে। কয়েক মাস আগের কথা, আমি আমার পূর্ণ ইচ্ছাশক্তিকে ব্যয় করে অত্যন্ত আগ্রহ-উদ্দীপনা ও একাগ্রতার সঙ্গে কাজটির পূর্ণতা দানের চেষ্টা শুরু করি। যাতে কিছুটা সফলতাও পেয়েছি। জানি না কতটুকু কী লিখেছি? তবে যা-ই হোক না কেন, তার ফলাফল এখন আপনাদের সামনেই রয়েছে।

আমি এই কথা অকপটে স্বীকার করছি যে, এই গ্রন্থটি লেখার ক্ষেত্রে আমার এক মুসলিম বন্ধুর এতটুকু হস্তক্ষেপ তো অবশ্যই আছে যে, তিনি আমার দৃঢ়সংকল্পের প্রদীপকে যখন প্রতিকূল আবহাওয়ায় নিভে যেতে দেখেছিলেন, তখন চুপচাপ বসে থেকে তামাশা দেখেননি, বরং অবিরত চেষ্টা করেছেন যেন আমার প্রদীপটি আলোহীন না হয়ে যায়।

বইটির মূল বিষয়বস্তু লেখার ক্ষেত্রে না আমি কারও কাছ থেকে ধার নিয়েছি। আর না কেউ আমাকে শিখিয়ে দিয়েছে, বরং এই বইয়ে আমি যা-কিছুই লিখেছি, নিজের অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ ও হৃদয়ের বিশ্বাসের আলোকেই

লিখেছি। এ ক্ষেত্রে আমি কারও কথা না শুনে হৃদয়ের কথা শুনেছি। হৃদয়কে জিজ্ঞেস করে লিখেছি। পুরো বিষয়টি হৃদয় দিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করেছি। তবে হ্যাঁ, সাধারণ মানুষের ন্যায় আমিও একজন মানুষ। আমারও হতে পারে ভুলভ্রান্তি আর স্খলন। হতে পারে কোনো ঘটনার ব্যাপারে নিজের রায় ব্যক্ত করতে গিয়ে সত্যতার বিচারে আমি বড় ধরনের কোনো ভ্রান্তির শিকার হয়ে গেছি। ভবিষ্যতে নতুন কোনো জ্ঞানের আলোকে হয়তো আমার পূর্বের সেই রায় পরিবর্তন করারও প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। যাহোক, আপাতত আমি এজন্য আনন্দিত, এই গ্রন্থে আমি যা-কিছুই লিখেছি, নিজের হৃদয়ের বিশ্বাসের আলোকেই লিখেছি। এই ক্ষেত্রে কোনো মানুষের সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টি আমায় ধোঁকা দিতে পারেনি। তাই আমার বিশ্বাস, ভবিষ্যতেও যদি কোনো ঘটনার ব্যাপারে আমার রায় পরিবর্তন করার প্রয়োজন দেখা দেয়; তাহলে সেই পরিবর্তনও আমার হৃদয়ের কথা শুনবে এবং হৃদয়ের আদেশের সামনে মাথানত করে নেবে।

## আমার অপরিপূর্ণ চেষ্টা

আজ আমি আপনাদের হাতে যে বইটি তুলে দিচ্ছি, তা ইতিহাস ও সাহিত্যের সুতোয় নতুন কোনো চিত্তাকর্ষক সংযোজন নয়। আশা করি সুহৃদ পাঠকরা আমার এই কথাকে বিনয় কিংবা শিষ্টতা মনে করবেন না। আসলেই বিষয়টি এমন। বলতে লজ্জা কী? কল্পনার আল্পনায় হৃদয়ের মণিকোঠায় প্রিয় মুহাম্মাদের জীবনের যে চিত্তাকর্ষক চিত্র আমি এঁকেছি, কাগজের পাতায় কলমের কালি দিয়ে তা ফুটিয়ে তুলতে পারিনি। এক দিকে সময়ের স্বল্পতা, অন্যদিকে জ্ঞানের দীনতা, এ ছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন ধরনের পেরেশানি ও দুশ্চিন্তা, সব মিলিয়েই বলা যায় গ্রন্থটি অসম্পূর্ণ রয়ে গেল।

অত্যন্ত লজ্জার অনুভূতি নিয়েই আমি এই বাস্তবতা স্বীকার করছি যে, বিদ্যমান আকৃতিতে এই বইটি না সাহিত্যের বাগানের মনোহারী কোনো ফুল হয়েছে, আর না ইতিহাসের কোনো অনবদ্য সংকলন। তাই আমি আমার সামান্য কিতাবকে জ্ঞানবিজ্ঞান বা সাহিত্যের কোনো রত্নভান্ডার দাবি করে আজকের এই শিক্ষিত ও বিজ্ঞানমনস্ক পৃথিবীর সামনে পেশ করার দুঃসাহস দেখাতে পারব না। বরং নিজের ভুলত্রুটি, অক্ষমতা ও মানসিক পেরেশানির কথা স্বীকার করেই সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি প্রিয় মুহাম্মাদের পবিত্র কদমে আমি আমার ভালোবাসার হৃদয়বিদারক গল্পের কিছু 'ছেঁড়াপাতা' উপহারস্বরূপ পেশ

করলাম। যার ভালোবাসার অনলে আশেক হৃদয়গুলো পুড়ে পুড়ে অঙ্গার হয়।

সঙ্গে সঙ্গে এই আশাও করছি যে, দ্বীনের প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিরা ও আমার সাহিত্যিক ভাইয়েরা এই গ্রন্থের ভুলত্রুটিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। কারণ, এর বাক্যগত ভুল ও সাহিত্যের ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে লেখক নিজেই স্বীকারোক্তি দিয়েছেন।

সাহিত্যের দিকগুলো বাদ দিয়ে মূল বিষয়বস্তু ও রাসুলের শানে যদি আমার কোনো ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে, তাহলে আমি সেই ব্যক্তিকে আমার পরমবন্ধু মনে করব, যিনি চিঠির মাধ্যমে আমাকে সেই ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে অবগত করবেন।

তবে হ্যাঁ, অযথা যারা দোষ বের করার চেষ্টা করবেন, সমালোচনার তির নিক্ষেপের চেষ্টা করবেন, তাদেরকে আমি আমার প্রভুর হাতে সোপর্দ করলাম।

—স্বামী লক্ষ্মণ প্রসাদ

# প্রথম পর্ব

## পৃথিবীর আকাশে অজ্ঞতার কালো মেঘের ঘনঘটা

পৃথিবীর পথহারা মানুষকে পথের দিশা দিয়ে, কুফর ও মিথ্যার অমানিশায় আচ্ছন্ন মানবতাকে মহাসত্যের আলো দেখিয়ে যেদিন ঈসা আ. ঊর্ধ্বলোকে গমন করেন, তারও অনেক পরের কথা। সূর্যের আশেপাশে পৃথিবী তখন ৫৭১তম চক্কর দিচ্ছিল। পুরো পৃথিবীর সভ্যতা-ভব্যতা যেদিন মাটিচাপা পড়েছিল, নীতি-নৈতিকতার সমস্ত আইনকানুন যখন ভূলুণ্ঠিত হচ্ছিল, ভালোবাসার শক্তিতে নয়, ক্ষমতা আর পেশিশক্তিতেই যখন মানুষ বিশ্বাসী ছিল। ন্যায়-ইনসাফ নয়, অত্যাচার আর উৎপীড়ন যখন ক্ষমতায়, যে হৃদয়ে নুরে ইলাহির বসত হওয়ার কথা ছিল, তা ছিল গোমরাহি আর অজ্ঞতার আস্তানা। আল্লাহকে দেওয়া সমস্ত প্রতিশ্রুতি অবাধ্য বান্দারা একে একে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিচ্ছিল। আমি সেই সময়ের কথা বলছি, সেই কালো দিনগুলোর কথা বলছি, যখন এই পৃথিবী ঘোর আঁধারে ছেয়ে গিয়েছিল।

সেদিন এমন কোনো মাথা ছিল না, যে মাথা প্রভু মহীয়ানের ক্ষমতা ও প্রভাবের আঙিনায়, দয়া ও দানের দরজায় নত হবে। এমন একজন লোকও সেদিন ছিল না, যে তার প্রভুকে প্রভু বলে স্বীকার করবে। যে কপাল শুধু এবং শুধুই আল্লাহর দরবারে নত হওয়ার ছিল, কত-না জালিমের দরগাহে তা অপমান আর অপদস্থতার সেজদায় পড়েছিল।

হিন্দুস্তান, এ তো সেই হিন্দুস্তান, যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধ্বজাধারী হওয়ার দাবিদার ছিল। কত মুনিঋষির জননী হওয়ার গৌরব যার ছিল। তার উত্তর হতে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম, পুরোটা এক মূর্তিশালায় পরিণত হয়েছিল। তার মূর্খ বাসিন্দারা পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষ-তরু, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, বকরি-গাভি, নদ-নদী, সাপ-বিচ্ছু, এমন নাম না জানা কত-না কিছুকে নিজেদের উপাস্য ভেবে মিথ্যা পূজার লানতে ডুবে ছিল।

শ্রীকৃষ্ণের তপজপকারী আর ধ্বজাধারীরা সেদিন দুনিয়া অন্বেষণের গোলকধাঁধায় পড়ে মৌলিক শিক্ষা থেকে দূরে সরে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের লজ্জাজনক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল।

বাবেল তো সেই শহর, যেখানে একদা এক স্বতন্ত্র সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। সেটাও তারকা আর নক্ষত্রপূজার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়! তার সেই মহান সভ্যতা-সংস্কৃতি মনগড়া কাল্পনিক ধ্যানধারণার চোরাবালিতে হারিয়ে গিয়েছিল। রোম এবং গ্রিকের সেই প্রভাব-প্রতিপত্তিও বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। যা-কিছু সুন্দর ও স্নিগ্ধ ছিল, অসুন্দর এবং অশুভের আঁধারে তা ম্লান হয়ে গিয়েছিল। বিশাল রোম সাম্রাজ্যের শিক্ষা ও সভ্যতার সব আইনকানুন ক্ষমতা ও আধিপত্যের নেশায় মাতাল গথ[৫] ও গল[৬]-এর ন্যায় নিকৃষ্ট জাতিদের দ্বারা ভূলুণ্ঠিত হয়ে পুরো ইউরোপে ধ্বংস ও তাণ্ডবের এক ঝড়ো হাওয়া বইয়ে দিয়েছিল। জালেম ও দাম্ভিক শাসকদের এক ভ্রুকুঞ্চনেই যখন হাজার হাজার নিরীহ নিরপরাধ মানুষের দেহ থেকে মাথা আলাদা হয়ে যেত।

বেহায়াপনা ও আত্মপূজার নির্লজ্জ প্রদর্শনী দেখে স্বয়ং লজ্জাও বোধহয় কোনো অতল সমুদ্রে গিয়ে ডুবে মরত। অত্যাচারী শাসকরা তাদের প্রজাদেরকে জুলুম-নিপীড়নের শৃঙ্খলে বন্দি করে রেখেছিল। তাদের ধারালো তরবারি প্রজাদের রক্তচোষার জন্য সারাক্ষণ কোষমুক্ত থাকত। কারও এমন দুঃসাহস ছিল না যে, গোলামির এই অভিশপ্ত শৃঙ্খলকে গলা থেকে খুলে ঘৃণাভরে নিক্ষেপ করবে এবং রাজাদের অবর্ণনীয় অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আওয়াজ তুলবে। তা ছাড়া তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া

---

৫. **গথ :** গথরা ইউরোপের একটি নৃগোষ্ঠী। জর্দানেস নামে ষষ্ট শতকে একজন গথিক ঐতিহাসিক ছিলেন। তার মতে, গথরা সুইডেন থেকে বের হয়ে বাল্টিক সাগর পাড়ি দিয়ে ভিসতুলা নদীর উপত্যকা অবধি পৌঁছেছিল। ৩য় শতকে তারা আরও দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে দানিয়ুব নদীর পাড় অবধি পৌঁছায়। কৃষ্ণসাগরের আশপাশেও চলে যায় তারা। ওই শতকেই গথ সৈন্যরা পূর্ব গ্রিসের থ্রাস ও দাসিয়া অঞ্চল তছনছ করে। তারা এজিয়ান সমুদ্রের পাড়ের এশিয়া মাইনরের অনেক নগরও ধ্বংস করে। ২৬৭ থকে ২৬৮ এথেন্স আক্রমণ করে নগরটি ধ্বংস করে। তারপর তারা ইতালির দিকে চোখ দেয়। প্রায় এক শতক ধরে রোমানদের সঙ্গে যুদ্ধ চলে। বলকান অঞ্চল ও ভূমধ্যসাগরের উত্তরপূর্ব অঞ্চল রক্তে সয়লাব হয়ে যায়। সেই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অন্যান্য গোত্রগুলি গথদের সাহায্য করে। ৪র্থ শতকে গথদের রাজা ছিল আরমানারিক। তার রাজ্যটি বালটিক থেকে কৃষ্ণসাগর অবধি বিস্তৃত ছিল।

৩৭০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ গথরা দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। ১. অসট্রোগথ। ২. ভিসিগথ।-সম্পাদক

৬. **গল :** গল প্রাচীনকালে পশ্চিম ইউরোপে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক অঞ্চলকে বোঝায়। যেটি পূর্বে রাইন নদী ও আল্পস পর্বতমালা, দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর ও পিরেনিজ পর্বতমালা এবং পশ্চিমে ও উত্তরে আটলান্টিক মহাসাগর দিয়ে বেষ্টিত ছিল। বর্তমানকালে এর বেশির ভাগ অংশ নিয়ে ফ্রান্স রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে।-সম্পাদক

দীর্ঘদিনের এই গোলামি সইতে সইতে বলা যায়, তাদের চিন্তা-চেতনাও গোলামে পরিণত হয়েছিল। এমন লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার জীবনকেই তারা তাদের ভাগ্য বলে মেনে নিয়েছিল। হৃদয়ের গহিনে দীর্ঘশ্বাস ও সীমাহীন আক্ষেপ নিয়ে এভাবেই কেটে যেত তাদের অপদস্থের জীবন। কারও হৃদয়ে যদি কখনো আজাদির চেতনা জেগেও উঠত, তাহলে শাসকদের শক্ত থাবা গলা টিপে ধরে তাকে চিরতরে ঘুম পাড়িয়ে দিতে সদা প্রস্তুত থাকত।

## শয়তানের দোসরদের কারগুজারি

সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রচার-প্রসারের দাবিদারদের অবস্থাই যখন এতটা লজ্জাজনক ছিল। তখন অপরাপর অসভ্য ও বর্বর জাতিগুলোর অবস্থা যে কতটা করুণ ছিল, তা সহজেই অনুমেয়।

সুবিশাল এই পৃথিবীর বুকে মানুষ রাজাধিরাজ সেই মহান প্রতাপশালী আল্লাহর আইনেরই বিরোধিতা শুরু করল এবং তাঁর রাজত্বে তাঁরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করল। দয়াময় প্রভুর ভালোবাসার আঙিনাকে ছেড়ে শয়তানের আস্তানাকেই নিজেদের উপাসনালয় বানিয়ে নিয়েছিল। ক্ষমতাবানরা তাদের দয়া ও সহমর্মিতার হাত প্রজাদের মাথার ওপর থেকে উঠিয়ে নিয়েছিল। আইনকানুন? সেতো ধনী ও প্রভাবশালীদের পৈতৃক সম্পত্তি হয়ে গিয়েছিল। জুলুম ও স্বৈরতন্ত্রের সামনে ইনসাফ ও নীতি-নৈতিকতার পাহাড় ধসে পড়েছিল। সমাজ ও দেশের নেতৃবৃন্দ যখন যেভাবে চাইত, আইনের খাতাটা ওলটপালট করে নিত। সমাজের উচ্চবর্গের মানুষের অপরাধ, তা যত বড়ই হোক না কেন, যেন কিছুই নয়। কিন্তু বেচারা গরিব-অসহায়দের অবস্থা ছিল বড় সঙ্গিন। সামান্য থেকে সামান্যতর অপরাধেই তাদের ওপর নেমে আসত কঠিন শাস্তি। কখনো লেলিয়ে দেওয়া হতো কোনো ক্ষুধার্ত হিংস্র পশুকে, কখনো-বা পশু থেকেও হিংস্র কোনো মানুষকে। আসমানের নিচে জমিনের ওপরে মানুষের সামনেই মানবতাকে ছিঁড়ে-ফেড়ে খেত পশুত্ব। প্রজাদের ভালো-খারাপের চারিত্রিক সনদ কর্তাদের হাতে ছিল। অধিকাংশ সময় এমন হতো যে, কোনো গোলাম, অধীনস্থ বা গরিব যুবকের নববধূর বিয়ের প্রথম রাতের ফুলশয্যা তার মনিব, সর্দার বা নেতার বিছানায় হতো। অন্যদিকে সেই বিবাহিত অসহায় যুবক? তার যৌবনের সব স্বাদ-আহলাদ তো কর্তাদের ধ্বংসাত্মক লালসা জোঁক হয়ে চুষে নিয়েছে।

## নারী ও দাসদের অপমান

সেই সময় মানুষের ভেতরে লুকিয়ে থাকা পশুত্ব পূর্ণ রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। গোলাম-অধীনস্থদের সঙ্গে চতুষ্পদ জন্তুর মতো আচরণ করা হতো। মহিলাদের মনে করা হতো কামুক পুরুষসম্প্রদায়ের লালসা ও আনন্দ-ফুর্তির পণ্য। যেন তাদের জন্মই হয়েছে পুরুষের কামনা মেটাতে। মানবের এই দুনিয়ায় মানবসৃষ্টির এমন পবিত্র ও মহোত্তম মাধ্যমের এরচেয়ে বেশি মূল্য ছিল না। এই দুনিয়ার বাঁকা চোখে তারা যতসব ষড়যন্ত্র ও সমস্যার কারণ হিসাবে চিহ্নিত ছিল। ভালো কিছু করার যোগ্যতাই যেন নারীর মধ্যে নেই।

## অজ্ঞতার প্রাণকেন্দ্র

এক দিকে যেমন পুরো পৃথিবী থেকে মনুষ্যত্ব ও সভ্যতার নামনিশানা মিটে গিয়েছিল, অন্যদিকে পৃথিবীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে গোমরাহি, বেহায়াপনা, মূর্খতা, অশ্লীলতা, জুলুম-নিপীড়ন এবং ক্ষমতার অপব্যবহার ছড়িয়ে পড়েছিল। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত আরবভূমি এসব অসভ্যতা, অশ্লীলতা, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও শয়তানের প্রতি পূর্ণ আস্থা, কুফর ও জুলুম-নিপীড়নের প্রাণকেন্দ্রে রূপ নিয়েছিল। যেখানে পুরোদমে শয়তান তার রাজত্ব কায়েম করেছিল। বলা যায়, পৃথিবীর অপরাপর মূর্খ ও নিকৃষ্ট জনগোষ্ঠীগুলো আরবের এই অসভ্য ও বর্বর জাতির হাতে বাইয়াত হয়েছিল।

## মায়াবীনীর নৃত্যে পাগল

সেখানকার পশুতুল্য বাসিন্দারা বিবেক-বোধ ও আখলাক-চরিত্রের সব নীতিকেই মদের উপচানো রঙিন পেয়ালায় ডুবিয়ে দিয়েছিল। লজ্জাশরম? তা তো কবেই সাগরের ঢেউয়ে হারিয়ে গিয়েছিল। এখানকার মরুপ্রান্তরের প্রতিটি স্থানেই কুফর-শিরক আর নাফরমানির ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবহমান ছিল। যেন এখানকার আকাশে কখনো সভ্যতার আলো ছড়ায়নি। আকাশজুড়ে শুধু এবং শুধুই অজ্ঞতা আর গোমরাহির কালো মেঘ ছেয়ে ছিল। গোমরাহির কালো আঁধারে ছাওয়া এখানকার আঁকাবাঁকা পথগুলোতে যেন কেউ কখনো হেদায়েতের আলো বিলায়নি। এখানকার বিজন রাতের ভয়াল নিরালায় কেউ কখনো আশার আলো নিয়ে এগিয়ে আসেনি। দূর দিগন্তের ওই সীমারেখায় ছড়িয়ে পড়েছিল শুধু কালো আর কালো, আঁধার আর আঁধার।

## আত্মপূজার নির্লজ্জ প্রদর্শনী

খোলামেলা সৌন্দর্য আর নির্লজ্জ প্রেম; কীই-বা বাকি ছিল? আত্মপূজা যেন তাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। জিনা-ব্যভিচার আর ধর্ষণ করে অনুতপ্ত হওয়া তো দূরের কথা, উলটো গর্ব আর অহংকার করত। ভরা মজলিসে সবার সামনেই নিজের পুরুষত্বের দাবি করত। শত শত নারীকে বিয়ে করা এবং নিরপরাধ কোনো নারীর বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন করে তার জীবনটাকে অভিশপ্ত করে তোলা যেন কিছুই নয়।

## অশ্লীল কবিতার আসর

কবি আর কাব্য তো তাদের মন-মস্তিষ্কে জেঁকে বসেছিল। উচ্ছ্বাস আর উচ্ছলতায় টইটম্বুর স্বভাব ছিল তাদের। প্রকাশ্যে সৌন্দর্য প্রদর্শনী, মদ্যপান, ধর্ষণ আর ব্যভিচার, কী বাদ ছিল? নিজের ভেতরের সুপ্ত কামনাকে জাগিয়ে তোলার সব আয়োজনই তাদের কাছে বিদ্যমান ছিল। কাব্য তো যেন আকাশের চন্দ্র-সূর্যের স্থান দখল করে বসেছিল। সেই সময় কবিতা আবৃত্তি করতে পারাই ব্যক্তির যোগ্যতার বড় প্রমাণ ছিল। সুন্দরী রমণীদের নামে কবিতা রচনা করে তা জনসম্মুখে গাওয়া হতো। নারীর রূপ-যৌবনের বর্ণনা এবং যৌন সুড়সুড়িমূলক সেসব কবিতা আবৃত্তি করে নির্লজ্জ কবিরা যেমন 'বাহ বাহ' কুড়াত, তেমনই যুবসমাজেরও চারিত্রিক ও নৈতিক অবক্ষয় ঘটত।

## সতীত্ব বিকিয়ে অর্থোপার্জন

সুন্দরী দাসীদের নাচ আর ছলনা শিখিয়ে আবেদনময়ী করে তোলা হতো। অতঃপর তাদেরকে বাজারের বিভিন্ন অলিগলি আর নিষিদ্ধ পল্লিতে বসিয়ে দিয়ে তাদের সতীত্ব বিকিয়ে অর্থোপার্জন করা হতো। আর সেই অর্থ নির্লজ্জ মনিবের ভোগবিলাস ও বিনোদনের কাজে ব্যয় হতো।

## বেহায়াপনার বিবস্ত্র প্রদর্শনী

কল্পকাহিনিপ্রিয় এই মানুষগুলো সেসব আসর-অনুষ্ঠানের প্রতি আগ্রহী ছিল, যেখানে উপস্থিত হয়ে তারা প্রাণ খুলে নিজেদের হৃদয়ের সব কথা প্রকাশ করতে পারত। ধুমধাম করে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানগুলোতে একদিকে যেমন নিজের বাহাদুরি ও কাব্য প্রতিভা প্রকাশ করা হতো, অন্যদিকে বেহায়াপনা ও নির্লজ্জতার এমন দৃশ্যও সেখানে উপস্থিত জনতা প্রত্যক্ষ

করত, যা কল্পনা করলেও প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। বুকটা ব্যথায় মুচড়ে ওঠে। আত্মমর্যাদার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে যায়।

## অহংকারের জবাইখানায় নিষ্পাপ মেয়েশিশু

নিজেদের বাহাদুরি আর আভিজাত্যের ওপর তাদের এতটাই গর্ব ছিল যে, তাদের অহংকারী স্বভাব অন্য কোনো মানুষের সামনে অত্যাবশ্যকীয় কোনো প্রয়োজনে নত হওয়াকেও চরম অপমানজনক বলে মনে করত। সম্মান ও আভিজাত্যের এই ভুল ধ্যানধারণা তাদের হৃদয়ে এতটাই বদ্ধমূল হয়ে বসেছিল যে, সেই নারীই তাদের কাছে সবচেয়ে বেশি অনিরাপদ হয়ে পড়ল, যার যৌবনকে তারা নিজেদের কামনা-বাসনা চরিতার্থের মাধ্যম বানিয়েছিল। যে কোমলপ্রাণ বালিকার নূপুরের রুনুঝুনু আওয়াজে তাদের হৃদয় উদ্‌বেলিত হয়ে উঠত, তার একেকটি হৃদয়গ্রাহী হাসিও যেন তাদের বুকে শত্রুর ছোড়া বিষাক্ত তির মনে হতো।

অজ্ঞতা ও জাহালত তাদের হৃদয়ে বীরত্ব ও সাহসিকতার যে ভুল ও অবাস্তব চিত্র তুলে ধরেছিল, তার কারণে সদ্য জন্ম নেওয়া নিষ্পাপ মেয়েশিশুটিকে গলা টিপে হত্যা করতেও তারা দ্বিধা করত না। পাঁচ-সাত বছরের ফুলের মত মেয়েটাকে খেলার ছুতোয় নতুন জামা পরিয়ে বাইরে নিয়ে গিয়ে মরুভূমির কোনো অচেনা গর্তে তাকে পাথরচাপা দিয়ে জীবন্ত পুঁতে ফেলা তো তাদের জুলুম-নিপীড়ন ও বর্বরতার সামান্য চিত্র। এ আর তেমন কী? বুক চিতিয়ে গর্বভরে সমাজের কাছ থেকে তো এই বলে সুনাম কুড়ানো যাবে যে, 'আমার ঘরে মেয়ে সন্তান নেই।'[৭]

---

৭. আরবের সব গোত্র ব্যাপকভাবে কন্যাশিশুদের হত্যা করত না। এ ক্ষেত্রে কয়েকটি গোত্র এগিয়ে ছিল। যেমন : রাবিয়া, কিন্দা ও তামিম গোত্র। (বুলুগুল আরব ফি মারিফাতি আহওয়ালিল আরব, ৩/৪২) আবার অনেক গোত্রে অভিজাত নারীরা অনেক স্বাধীনতা ভোগ করতেন। পুরুষদের ওপর অনেক ক্ষেত্রে তাদের কর্তৃত্ব ছিল। তারা পুরুষদেরকে যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করতেন আবার শান্তিতে একত্রিত করতেন। (আর রাহিকুল মাখতুম, ৪৩, ওয়ারাতুল আওকাফ ওয়াশশুউনুল ইসলামিয়্যা, কাতার) সে যুগেও এমন কিছু ভালো লোক ছিল যারা কোনো কন্যাশিশুকে হত্যা চেষ্টার খবর পেলে বাবার কাছে গিয়ে শিশুটিকে ক্রয় করে নিয়ে মুক্ত করে দিতেন। যেমন প্রখ্যাত আরব কবি ফারাযদাকের পিতামহ সা'সাআ ইবনে নাজিয়া আল মুজাশিই রা. জাহেলি যুগে প্রায় ৩৬০ জন কন্যাশিশুকে হত্যা করা থেকে উদ্ধার করেন। প্রতিটি শিশুর জন্য তাকে ২টি করে উট দিতে হয়। এমন আরেকজন ছিলেন যায়দ ইবনে আমর ইবনে নুফায়ল। (সিরাত বিশ্বকোষ, ৪/৭৩-৭৪)-সম্পাদক

## ডাকাতির ভয়াবহ চিত্র

পথচলা কোনো একাকী মুসাফিরের কাপড় খুলে নিয়ে তাকে গোলাম বানিয়ে বিক্রি করা ছিল তাদের জন্য ছেলেখেলা। নিরস্ত্র মানুষকে রক্ত আর ধুলোবালিতে একাকার করে তার রক্তে নিজেদের হাত রঞ্জিত করা ছিল তাদের অত্যন্ত প্রিয় কাজ। নিরপরাধ মানুষের রক্তাক্ত লাশের ওপর দাঁড়িয়ে পৈশাচিক উল্লাস করে তারা চরম সুখ অনুভব করত। কোনো অসহায়ের 'আহ' ধ্বনি কিংবা কোনো মজলুমের করুণ চাহনি কী তাদের হৃদয়কে বিগলিত করত না! কী করে তা হবে? তারা তো ছিল অত্যাচারী নেকড়ে, মানুষখেকো হিংস্র পশু। যে হৃদয়ে হেমন্ত আঘাত হেনেছে, সে হৃদয়ে কী করে ভালোবাসার ফুল ফুটবে?

## রক্তের স্রোত

যুদ্ধবিগ্রহ আর দাঙ্গাহাঙ্গামা তো ছিল তাদের দৈনন্দিনের রুটিন। সামান্য থেকে সামান্যতর বিষয়েও তরবারি কোষমুক্ত হতো। মরুভূমির শুকনো বালুপ্রান্তরে বয়ে যেত রক্তের স্রোত। এই দাঙ্গাহাঙ্গামা শুধু গুটিকয়েক মানুষের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকত না; বরং কোথাও যদি প্রতিশোধের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রজ্বলিত হতো, তাহলে বসতির পর বসতি ভস্ম হয়ে যেত। ক্ষেতের ফসলের ন্যায় মানুষ কেটে পাড়াগাঁ বিরান করে ফেলা হতো। চাঁদ আর পৃথিবী তাদের আপন আপন কক্ষপথে অবিরাম পরিভ্রমণ করে যেত। কিন্তু আরবদের এই গোত্রীয় লড়াইয়ের কোনো বিরাম ছিল না। আরব ইতিহাসের পরতে পরতে এমন অনেক দীর্ঘ যুদ্ধের বর্ণনা পাওয়া যায়, যা পুরুষানুক্রমে বহাল থাকত। আশ্চর্যের বিষয় হলো, প্রায়শ এমন হতো যে, যোদ্ধারা জানত না ঠিক কী কারণে তাদের পূর্বপুরুষরা এই শত্রুতা সৃষ্টি করেছিল? কেন এই রক্ত খেলায় মেতে উঠেছিল? কারণ অজানা থাকলেও তাদের এটা খুব ভালোভাবেই জানা ছিল যে, বংশের মর্যাদা রক্ষায় অবশ্যই এই যুদ্ধ করতে হবে। এই লড়াই জিততে হবে। অস্তিত্ব রক্ষার এই লড়াইয়ে যেন কে অপরাধী তা মুখ্য নয়, বিজয় ছিনিয়ে আনাই মুখ্য।

## সুদি কারবার

পৃথিবীজুড়ে চলছিল অভিশপ্ত সুদি কারবারের রমরমা ব্যবসা। এটাকে মানুষ অত্যন্ত সম্মানের কারবার মনে করত। অসহায় দুস্থ মানুষদের গলায় ছুরি চালিয়ে মহাজনরা দিন দিন আঙুল ফুলে কলাগাছ হচ্ছিল। বহমান এই

সময়ে[৮] আমাদের হিন্দুস্তানে প্রচলিত 'জমিদারিপ্রথা' জাহেলিয়াতের সেই কালো অধ্যায়ের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

## জুয়া

জুয়াখেলা ছিল সমাজের আমির, ওমারা ও উচ্চবিত্ত মানুষদের সময় কাটানোর এক অতিউত্তম মাধ্যম। সমাজের যেখানে-সেখানে জুয়াখানা তৈরি করা হতো। সেখানে ধনবানরা নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষা করতে এসে কখনো বড় জায়গির নিয়ে ফিরে যেত, আবার কখনো ফিরত নিঃস্ব হয়ে।

## মূর্তিপূজা

এককথায় তারা শয়তানের পূজা করত। তাদের নির্দিষ্ট কোনো ধর্ম ছিল না। রাতদিন ঈমান বিক্রি করাই ছিল তাদের অভ্যাস। মূর্তিপূজা ছিল তাদের দ্বীন-ঈমান। প্রত্যেক গোত্র এমনকি প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে একটা মূর্তি থাকত, যাকে সে বা তারা প্রভু ভেবে পূজা করত। নিজেদের সব চাওয়া তার কাছেই চাইত এবং সেই মূক আর বধির মূর্তির মাঝেই নিজেদের সফলতা ও ব্যর্থতার কারণ খুঁজত। তাদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের একটি আশ্চর্যকর দিক ছিল, কোনো একটা মূর্তির পূজা করতে করতে যখন কয়েক যুগ অতিবাহিত হয়ে যেত, তখন তারা তাকে 'পুরোনো' ভেবে নতুন কোনো উপাস্যের খোঁজ করত এবং দ্বিতীয় কোনো সুন্দর মূর্তির সন্ধান পেলে পুরোনোটাকে ঘর থেকে বের করে দিত। পুরো আরবদ্বীপের প্রতিটি ঘরই ছিল একেকটি মূর্তিশালা। এতসব মূর্তির মাঝে হোবল, আবআব, উযযা, আসাফ, নায়েলা, লাত ও মানাত নামক মূর্তিগুলোকে সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাধর উপাস্য মনে করা হতো। এই মূর্তিগুলোর পূজাকেই তারা নিজেদের ধর্ম এবং সফলতার উপায় মনে করত। ক্ষমতার এসব মূর্তি ছাড়াও আরও অনেক অনেক প্রসিদ্ধ মূর্তি ছিল যেগুলোর সামনে আরবদের মাথা অবনত থাকত।

এই মূর্তিগুলোর ইবাদতের পদ্ধতিও ছিল খুবই লজ্জাজনক। তাদের বিশ্বাস ছিল, গুনাহ ও পাপাচারের কারণে মানুষের পোশাক অপবিত্র হয়ে যায়। তাই তারা যখন কোনো মূর্তিশালায় যেত, নিজেদের বস্ত্র খুলে প্রবেশ করত। বিবস্ত্র

---

[৮] . ১৯৫০ সালের ১৬ ডিসেম্বর পূর্ববঙ্গ জমিদারি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের মাধ্যমে ভারত ও তৎকালীন পাকিস্তান থেকে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হয়। যা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া ১৯৪৮ সালের ১০ এপ্রিলে শুরু হয়। আর বক্ষ্যমাণ বইটি দেশ বিভাগের পূর্বে রচিত। (বাংলা পিডিয়া, পূর্ববঙ্গ জমিদারি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০, ভূমি সংস্কার বোর্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার)।-সম্পাদক